কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত দ্বিজেন্দ্র বক্তৃতামালা

দ্বিজেন্দ্র-দর্পণ

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

বিক্রয় কেন্দ্র :
২১১/১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

শাখা :
পাটনা :
অশোক রাজপথ,
পাটনা-৪

এলাহাবাদ :
৪৪, নেতাজী সুভাষচন্দ্র মার্গ,
এলাহাবাদ-৩

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

জানকীনাথ বসু এম. এ. কর্তৃক বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ, ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও লোকসেবক প্রেস, ৮৬এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আদর্শ শিক্ষক

চিরন্তন অধ্যক্ষ

স্বর্গীয় গিরিধর চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

সূচীপত্র

দ্বিজেন্দ্র-দর্পণ

ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলাল

এই প্রবন্ধে ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের আলেখ্য অঙ্কন করিবার প্রয়াস পাইব। কিন্তু প্রথমেই মনে একটা প্রশ্ন জাগিতেছে—ব্যক্তিত্ব, যাহা স্বতঃই আমাদের মনে প্রতিভাত হয়, তাহার স্বরূপ কি ভাষার বা বর্ণনার সাহায্যে নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট করা সম্ভব? বিখ্যাত ইংরেজী লেখক মম বলিয়াছেন, ভাষার সাহায্যে কোন মানুষের রূপ নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা যায় না। প্রত্যক্ষের দর্পণে যাহা অপরোক্ষ করি ভাষার মাধ্যমে তাহা অবর্ণনীয়। ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও বোধহয় সে কথা সত্য। কারণ কাহারও ব্যক্তিত্ব তাহার গুণাবলীর বা কীর্তিকলাপের ফর্দ মাত্র নহে, তাহা তাহার দোষের বা পতন-ত্রুটির অবিমিশ্র বর্ণনাও নহে, তাহা প্রাণ-রসে সঞ্জীবিত অদ্ভুত অনন্য এমন একটা প্রকাশ, যাহা চলনে বলনে, হাসিতে ভঙ্গিতে, আলাপে-আলোচনায়, খেয়ালে মুদ্রাদোষে, মহত্ত্বে নীচতায়, অনুরাগে-বিরাগে ক্ষণে ক্ষণে বহু-দ্যুতি হীরকের মতো ঝকমক করিতে থাকে, যাহা বাহিরে একরূপ, অন্তরে একরূপ, অন্তরঙ্গ বন্ধু মহলে যাহা উচ্ছল, অপরিচিতের নিকট যাহা গম্ভীর—সেই

ব্যক্তিত্বের চিত্র ভাষা দিয়া আঁকা যায় না, ফোটোগ্রাফের বিজ্ঞানকে তাহা ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়ে। শেলীর জীবনচরিত-লেখক আঁদ্রে মোরোয়া তাঁহার বিখ্যাত 'এরিয়েল' নামক পুস্তকে, এমিল লাডভিগ তাঁহার নেপোলিয়ন এবং ক্লিওপেট্রার জীবনচরিত-চিত্রণে, জন ডিক্‌সন কার বিখ্যাত লেখক কোনান্ ডয়েলের জীবন-আলেখ্যে, লিটন স্ট্র্যাচি ভিক্‌টোরিয়ার জীবন-চরিতে এই ব্যক্তিত্বকেই ভাষার ছাঁচে ধরিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি সুখ-পাঠ্য, বস্তুত বিখ্যাত লেখকদের লেখা জীবন-চরিত মাত্রেই সুখ-পাঠ্য

গ্রন্থ,—কিন্তু তাহাতে ওই অবর্ণনীয় ব্যক্তিত্ব নামক আশ্চর্য প্রকাশটি, যাহা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একটা বিশেষরূপে বিকশিত বিচ্ছুরিত হইয়া অবশেষে মহাকালের মহাশূন্যে বিলীন হয়, তাহার স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে কি? সন্দেহ হয়। জীবনচরিত-লেখক যে চিত্র আঁকেন তাহা তাঁহার নিজের সৃষ্টি, সে সৃষ্টিতে তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোছায়া পড়ে; বিধাতার সৃষ্টি 'ব্যক্তিত্বের' সঙ্গে তাহার অমিল থাকার সম্ভাবনাই বেশি মনে হয়।

তবু জীবন-চরিতেই ব্যক্তিত্বের সন্ধান করিতে হইবে। উহার মধ্যেই আভাসে-ইঙ্গিতে, দুই একটি আচরণে বা আলাপে হয়তো ব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় পাইব। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে— 'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।' সেই একটুকু ছোঁয়া বা একটুকু কথা জীবন-চরিতের পাতাতেই পাওয়া যায়। তাহা লইয়াই ফাল্গুনী রচনা করিতে হইবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে বিজ্ঞানও অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন। কিন্তু রহস্যের সমাধান হয় নাই। একই পরিবেশে একই পিতা-মাতার সন্তান কেন বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হয়, এ রহস্যের সমাধান জন্ম-বীজের মধ্যে যে genes-এর মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া বিজ্ঞানীরা বলেন,—সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। শুনিয়াছি নানা প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া জার্মানিতে এবং রাশিয়ায় মানুষের ব্যক্তিত্ব বদলাইয়া ফেলিয়াছে। অনেক শিবকে তাহারা বাঁদর করিয়াছেন, কিন্তু বাঁদরকে শিব করিয়াছেন এ রকম খবর শুনি নাই। আমাদের পুরাণে এরকম খবর দুই একটা আছে, দস্যু রত্নাকর কবি বাল্মীকি হইয়াছিলেন, রাক্ষস রাবণের ভ্রাতা রামভক্ত বিভীষণে রূপান্তরিত হইয়া রাবণ-নিধনে সহায়তা করিয়াছিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতেও মাতাল জগাই-মাধাই পরম ভক্তে পরিণত হইয়া আজও আমাদের কাছে অভিনন্দন লাভ করিতেছেন। কিন্তু এসব রূপান্তর আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে হয় নাই।

হইয়াছিল সেই বিস্ময়কর মানসিক বিবর্তনে—যাহার ঠিক সংজ্ঞা আমরা এখনও ঠিক করিতে পারি নাই। তপস্যা, ভক্তি, পূর্বজন্মের সুকৃতি—প্রভৃতি নানা নাম দিয়া আমরা তাহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু তাহা প্রয়াস মাত্র, রহস্য রহস্যই থাকিয়া গিয়াছে।

বংশ-মহিমা—ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'পেডিগ্রি'—তাহা অবশ্যই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক। অনেক উন্নাসিক ব্যক্তিকে মন্তব্য করিতে শুনিয়াছি যে, পেডিগ্রি আবার কি! মানুষ মাত্রেই সমান। পেডিগ্রির ছাপ মারিয়া একটা মানুষকে আলাদা করিয়া দেখার প্রয়োজন নাই। তাঁহারাই কিন্তু যখন কুকুর বিড়াল বা গরু কিনিতে যান তখনই পেডিগ্রির খবর লন, বাজারে কোনও জিনিস কিনিতে গেলে সন্ধান করেন, made in England, বা made in Germany ছাপ দেওয়া কোন জিনিস আছে কি না। মানুষের বেলাতেই তাঁহারা মনে করেন সবাই তুল্য-মূল্য। তাঁহাদের কথা শুনিয়া Ben Jonson এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে—"It is the highest of earthly honours to be descended from the great and good. They alone cry out against noble ancestry who have none of their own."

দ্বিজেন্দ্রলাল বিরাট বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে যে বিরাটত্ব দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হই, প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের যে ওজস্বিতা ও দীপ্তি তাঁহার চরিত্রে সমুজ্জ্বল, তাহা এই বিরাট বংশের উত্তরাধিকার। তাঁহার জীবনচরিতে তাঁহার বংশের বিস্তৃত পরিচয় আছে। সে পরিচয় মহিমাময়। তাহার সবিস্তার উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই কেবল উদ্ধৃত করিতেছি।

"নদীয়ার মহারাজের প্রসিদ্ধ দেওয়ান মনস্বী কার্তিকেয়চন্দ্র রায়

মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের জনক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মাতা শান্তিপুরের গোস্বামী অদ্বৈতাচার্যের বংশের কন্যা ছিলেন। পিতৃ-মাতৃ উভয় পক্ষেই দ্বিজেন্দ্রলাল সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের বংশধর ছিলেন।" মনস্বী কার্তিকেয়চন্দ্র রায় বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে গুণের জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়াছেন তাহা তাঁহার চরিত্রের অটলতা। সদ্য-আগত বিদেশী প্লাবনের জোয়ারে যখন সব কিছু ডুবিয়া ভাসিয়া যাইতে-ছিল, "যখন কৃষ্ণনগরের প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত, যখন সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড়প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পূর্ণ থাকিত, যখন লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন"—শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী তৎকালের বঙ্গসমাজে দুর্নীতি-প্লাবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন[১] তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কার্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়কে সে প্লাবনের মধ্যে তুঙ্গ-শির পর্বত বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। শুধু চরিত্রে নয় বিদ্যাতে এবং প্রতিভাতেও তিনি উত্তুঙ্গ ছিলেন। বাঙ্গালা, পার্শী ও ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন তিনি। সুগায়ক ছিলেন; গ্রন্থকারও ছিলেন। তৎপ্রণীত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' ও 'আত্মজীবন চরিত' বঙ্গভাষায় চরিতাখ্যান বিভাগে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। "তাঁহার চরিত্রে একদিকে যেমন আন্তরিক বিনয় ছিল, অন্যদিকে তেমনি অনমনীয় তেজস্বিতা ছিল। তিনি সত্যের অনুরোধে, কর্মচারী হইয়াও অনেক সময় মহারাজদিগের মুখের উপর অতি স্পষ্ট ও কঠোর প্রতিবাদ করিতেন; কর্তৃপক্ষ কোন সাহেবও কখনও অন্যায় করিলে নির্ভীক ভাবে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিতেন।"[২]

(১) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২২ দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত; ২য় সংস্করণ
(২) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২৫-২৬

তাঁহার নির্ভীক আচরণ কিন্তু তাঁহাকে বন্ধু-বিহীন করে নাই। তিনি বিজ্ঞাপন-পরাঙ্মুখ আড়ম্বরহীন আত্মগোপন-ক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বন্ধুবর্গের তালিকা বিস্ময়কর। "প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা ভূদেবচন্দ্র, লোহারাম শিরোরত্ন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্য-গুরু দীনবন্ধু, মহাকবি মধুসূদন, বিখ্যাত বক্তা রামগোপাল ঘোষ, বারাসাতের কালীকৃষ্ণ মিত্র, দ্বারকনাথ দে, পূর্ণচন্দ্র রায় প্রমুখ বঙ্গবাসীর মুখোজ্জ্বলকারী ব্যক্তিবর্গ কার্তিকেয়চন্দ্রের গুণমুগ্ধ, অকৃত্রিম সম-প্রাণ বন্ধু ছিলেন। সৌরভসমৃদ্ধ মকরন্দপূর্ণ কুসুম গহন বনে ফুটিলেও অলিদল আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার রোগ-শয্যাপার্শ্বে তৎকালীন ছোট লাট সার রিভার্স টমসনও অযাচিতভাবে আসিয়া-ছিলেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য।"[৩] অর্থাৎ সে যুগে তিনি বিদগ্ধ সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র জননী প্রসন্নময়ী আদর্শ হিন্দু-গৃহিণী ছিলেন। মনে হইত তিনি স্বামী পুত্র পরিজন ও আশ্রিত অভ্যাগতগণের সেবা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই যেন জীবন ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু "প্রীতি, করুণা, সরলতা ও অমায়িকতার প্রতিমূর্তি হইলেও দেবী প্রসন্নময়ীর চরিত্রে তেজস্বিতার অভাব ছিলনা। পালয়িত্রী স্বয়ং মহারাণীকেও তিনি কোনদিন কোন কারণে তিলার্ধ স্তুতিবাক্যে তুষ্ট করেন নাই।"[৪] অথচ তিনি পরম স্নেহময়ী ছিলেন, অপরের দুঃখে করুণায় বিগলিত হইতেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে তাঁহার পিতামাতার এই গুণাবলীর প্রকাশ দেখিলে মনে হয়, দর্পণে যেন প্রতিবিম্ব দেখিতেছি; একই নদীর ধারা যেন একই জলরাশি বহন করিয়া ভিন্ন রূপে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বতোরূপে পিতামাতার

(৩) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২৭

(৪) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৩৭

গৌরবময় চারিত্রিক উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ভাগ্য, ইহা তাঁহার গৌরব।

কিন্তু তাঁহার জীবনে তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের সন্ধান আমরা পাই কি? বাল্যকালেই তাঁহার জীবনে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল? তাঁহার জীবনীকার বলিতেছেন[৫], ছেলেবেলায় ধাত্রীর ক্রোড় হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি মারাত্মক রূপে আহত হন। এজন্য তাঁহার মুখখানা চিরদিনের জন্য বাঁকিয়া গেল—শেষ বয়সে মুখের বক্রতা অবশ্য খানিকটা কমিয়াছিল। আর একবার ঢেঁকির উপর হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। আর একটি খবর ছেলেবেলা হইতে তিনি দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া রোগে প্রচুর ভুগিয়াছিলেন। এই সব সংবাদগুলি প্রণিধানযোগ্য মনে করি। যে ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ বাল্যকাল হইতেই নির্মিত হয়, সেই বনিয়াদের উপর অনিবার্য দুরতিক্রম্য আঘাত ব্যক্তিত্বকেই যেন বিচিত্র ভাবে ভিতরে ভিতরে বদলাইতে থাকে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মম খোঁড়া এবং তোতলা ছিলেন, শেলী বাল্যকালে ইটন বিদ্যালয়ে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকালে প্রায়বন্দী-অবস্থায় ভৃত্যরাজকতন্ত্রের অধীনে থাকিতে হইয়াছিল। কীট্‌সের বাল্যজীবনও দুঃখময়[৬]। কিন্তু সে দুঃখ অন্য রূপ, তাহা দৈহিক নহে, মানসিক। খানিকটা দৈহিক দুঃখ অবশ্য ছিল, তিনি বেঁটে লোক ছিলেন, উচ্চতা ছিল মাত্র ৫ ফিট্। এইজন্য এই হ্রস্বতার জন্য তিনিও স্কুলজীবনে যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার আসল দুঃখ বাল্যেই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতামহ খাম-খেয়ালী ও পেটুক লোক ছিলেন এবং মা ছিলেন রতি-উন্মাদিনী মহিলা—nymphomaniac। কীট্‌সের মন বাল্যজীবনে সেই সুখময় স্নেহময়

(৫) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৪৩-৪৪-৪৫ (৬) দ্রষ্টব্য :—'Introduction to Keat's Works' by Harold Edgr Briggas. pp (XVI)

নিরাপদ আদর্শ আশ্রয় পায় নাই যাহা পাইবার জন্য প্রত্যেক শিশু উন্মুখ ও আকুল। কীট্‌স্‌ সারাজীবন অসুখী ছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন "My mind has been the most discontented and restless one that ever was put into a body too small for it".[৭] বায়রনও খঞ্জ ছিলেন। এই খঞ্জত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের উপর দাগ রাখিয়া গিয়াছে। বাল্যকালে বায়রনকে অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও দিন কাটাইতে হইয়াছিল।

প্রতিভাবান শক্তিশালীদের জীবনে বাল্যকালের এই সব অনিবার্য পীড়নের সাধারণত দুই-তিন রকম প্রকাশ দেখা যায়। অনেক সময় ছেলেটি দুর্দম বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। শেলীর জীবনে ইহা দেখা গিয়াছে। বাল্যকালেই তিনি নির্যাতনকারী বালকদের বিরুদ্ধে একাই রুখিয়া দাঁড়াইতেন। "They soon discovered that the smallest threat threw him into a passion of resistance. His eyes, dreamy when at peace, acquired under the enthusiasm or indignation a light that was almost wild, his voice became agonised and shrill."[৮] রবীন্দ্রনাথকেও পাঠশালায় এ দুর্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লাজুক ছিলেন। শেলীর মতো হাতাহাতি মারামারি করিতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকারও বলিতেছেন, দ্বিজেন্দ্রলালও ছেলেবেলায় লাজুক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি যেন বিশেষ ভাবেই স্বতন্ত্র ছিল। তিনি তাঁহার সহপাঠীদের সহিত মিশিতে পারিতেন না। তাহাদের সহিত খেলায় যোগ দিতেন না। Wordsworth ও Shelleyর বাল্য-কালের মানসিকতার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিকতার মিল আছে।

(7) Do-pp. XV111

(৮) Ariel—Andre Maurois (Jaico editon pp 11)

তাঁহার বাল্যের রচিত গানগুলিও করুণ ও বিষাদমাখা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এই অল্প বয়সে তোমার হৃদয়ে এমন কি বিষাদ বা দুঃখ থাকিতে পারে যাহাতে তোমার প্রায় প্রত্যেক গানেরই সুরে এমন বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়ে ?"[৯] এ বিষাদ অবচেতন লোকের বিষাদ, যে বিষাদের বীজ ভাগ্যবিধাতা শারীরিক পীড়া ও পীড়ন রূপে তাঁহার জীবনে বপন করিয়াছিলেন। তিনি লোকচক্ষু এড়াইয়া নির্জন প্রকৃতির ক্রোড়ে আত্মসমাহিত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। এই সময় তাঁহার স্বভাবজাত কবিত্বও বিষাদময় সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার জীবনীকার বলিতেছেন—"এই স্বভাবকবি বাল্যকালে অত্যন্ত অল্পভাষী ও গম্ভীর ছিলেন। অন্যমনে ও বিষণ্ণভাবে তিনি নিয়ত যেন আপনাতে আপনি নিমগ্ন থাকিতেন...তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত তিনি যেন কোন এক অজ্ঞাতলোকের অধিবাসী, দৈবাৎ ভ্রম-ক্রমে এই কোলাহল-ক্ষুব্ধ মর্ত্যলোকে আসিয়া পড়িয়াছেন। এখানে যেন কোন কিছুর সঙ্গে তাঁহার মনের ঠিক মিল হইতেছে না।"[১০] জীবনটাকে চিরকালই তাঁহার কোলাহল বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাঁহার একটা বিখ্যাত গানের প্রথম ছত্রই হইতেছে "জীবনটাতো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল"। তিনি শুধু যে তাঁহার সমবয়সী সহপাঠীদের সম্বন্ধেই উদাসীন ছিলেন তাহা নয়, নিজের সম্বন্ধেও ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে বৈরাগী ভোলানাথ আখ্যা দিয়াছিল। যখন তাঁহার আট নয় বৎসর বয়স প্রায়ই তখন তিনি স্কুলের বইখাতা হারাইয়া স্কুলে শাস্তি ভোগ করিতেন। তথাপি তিনি স্কুলের শিক্ষককে অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিয়া বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। ক্লাসে শুনিয়া শুনিয়াই তিনি সব পড়া মুখস্থ বলিতে পারিয়াছিলেন। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির নানা ঘটনা তাঁহার জীবনীকার সবিস্তারে লিখিয়া-

(৯) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫০-৫১
(১০) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫০-৫১

ছেন। বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সে ছেলেবেলা থেকে কেমন যেন একটু 'উদোমাদা' 'পাগলাটে' ধরণের ছিল। নিজের শরীর কিংবা বেশবিন্যাস প্রভৃতিতে তার আদপে কোনই খেয়াল ছিলনা। যাহাকে 'কাছা খোলা' লোক বলে সে একেবারে ঠিক তাই···। চুল আঁচড়ানো একটা ব্যাপার সে জানতই না ···"[১১]

এই লাজুক প্রকৃতির উদোমাদা স্বভাব-কবি বালকটির ব্যক্তিত্বে তখনই কিন্তু আর একটি নূতন ধরণের স্তর পড়িতেছিল। তাহা আত্মসম্মান-বোধ এবং দেশের পরাধীনতার সম্বন্ধে সচেতনতা। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র-মহিমা, তাঁহার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি, তাঁহার তীক্ষ্ন-ধী, তাঁহার অদ্ভুত স্মরণশক্তি ক্রমশই তাঁহাকে স্বদেশ-প্রেমের দিকে ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। আজকাল যেমন নানারূপ প্রেম-সঙ্গীত সর্বত্র প্রচলিত, সেকালেও তেমনি ছিল। কিন্তু এসব সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি বাল্যকালে যেসব সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গীত। আর্যগাথা প্রথম ভাগ নামে ইহা যখন প্রকাশিত হয়, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল উহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"যাঁহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেম-গীতকেই গীত মনে করেন, আর্যগাথা তাঁহাদের জন্য রচিত হয় নাই এবং তাঁহাদের আদর প্রত্যাশা করে না।"[১২] আর্যগাথায় আর্যবীণার দ্বিতীয় গানে দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্টভাষায় সক্ষোভে বলিয়াছেন—"যতদিন না দুঃখিনী মাতৃভূমির এই দুঃখ দৈন্য ও হীনতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় ততদিন ভারতবাসীর মুখে প্রেম-সঙ্গীত ভাল দেখায় না।"[১৩] বাল্যকাল হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল সুনীতিপরায়ণ আদর্শবাদী লোক ছিলেন। যে সাহিত্য-

(১১) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫২

(১২) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৮৮

(১৩) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৮৯

সৃষ্টিতে দেশের লোকের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটিতে পারে সেরূপ সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁহার মনঃপূত ছিল না। এই জন্যই উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিয়াছিল। তাঁহার এ মতবাদ যুক্তিসহ কি না তাহা বিচারের স্থান এ প্রবন্ধে নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও মতামত কিরূপ ছিল তাহাই কেবল বলিতেছি। তাঁহার এই অত্যন্ত শুচি আদর্শের উপাদান তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার পিতা ও মাতার চরিত্র হইতে। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র ও দেবী প্রসন্নময়ীর সুন্দর অথচ বলিষ্ঠ আদর্শের পরিবেশে তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে পরিবেশে কোনও কলঙ্কের, কোনও পদস্খলনের মলিনতা ছিল না। তিনি এক শুভ্র মহিমাময় পরিবারের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও সাহিত্যে তাহারই ছাপ পড়িয়াছে। কবি ব্রাউনিং স্বপ্নময় পরিবেশে মানুষ হইয়াছিলেন। স্কুলেও বেশীদিন পড়েন নাই,—"He managed his own education with the assistance of a tutor in Italian, a music master, his father's fine library of some six thousand volumes and the Dulwich Art Gallery which lay a short wood-land walk from his home and contained paintings by Audren del Sarto, Raphael and Titian···and others.[১৪] এই পরিবেশের প্রভাব ব্রাউনিংয়ের চরিত্রে এবং সাহিত্যে সুস্পষ্ট। দ্বিজেন্দ্রলালও আদর্শ পরিবারের মহত্ত্ব-মাধুর্যরসে অবগাহন করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রেও সে প্রভাব উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার এই আদর্শ-নিষ্ঠার আর একটা কারণও মনে রাখা উচিত। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগের জঘন্য পরিচয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিস্তৃত ভাবে

(১৪) Introduction to Browning's works—K. L. Knickerbocker

লিখিয়াছেন তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক বিখ্যাত পুস্তকে।[১৫] তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতি আগেই দিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার কৈশোরে ও যৌবনে বঙ্গসমাজে নানারূপ আন্দোলন হইয়াছিল সন্দেহ নাই। দুর্গামোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু, প্যারিচরণ সরকার প্রভৃতি প্রতিভাশালী বাঙালী মনস্বিগণ—যাঁহাদিগকে শাস্ত্রী মহাশয় নব্য-বঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় সমাজ কিছুটা সংস্কৃত হয়তো হইয়াছিল, কিন্তু সমাজের নোংরামি সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। এই নোংরামি এবং তৎকালীন সমাজ সংস্কারকদের আদর্শ দ্বিজেন্দ্র-চরিত্রকে যেন আরও পবিত্র, আরও নিষ্ঠাবান, আরও আদর্শমুখী করিয়াছে। নিউটন যাহাকে equal and opposite reaction বলিয়াছেন, ইহা যেন তাহাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব কি দ্বিজেন্দ্রলালের উপর পড়িয়াছল ? তাঁহার জীবনীতে ইহার কোনও প্রমাণ নাই। ব্যাপারটা বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পার্লামেন্ট অব·রিলিজনে স্বামিজী বক্তৃতা দেন। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স ত্রিশ বৎসর। তখন তিনি বাংলা-দেশে চাকুরি করিতেছেন। পার্লামেন্ট অব রিলিজন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের জীবনচরিতে লেখা আছে'—"The world's Parliament of Religion which was held in the city of Chicago in September 1893 was undoubtedly one of the greatest events in the history of the world, making an era in the history of religions, especially of Hinduism" :[১৬] এত বড় ঘটনা দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বের উপর কোন ছাপ ফেলে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। ছাপ

১৫) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২২

(১৬) Life of Swami Vivekananda pp. 3 65

নিশ্চয়ই পড়িয়াছিল—এত বড় একটা ঘটনা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন একথা ভাবা যায় না। কিন্তু কেন জানি না তাঁহার জীবনীতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। বিবেকানন্দের জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেম ও দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা-নাটকে ব্যক্ত স্বদেশ-প্রেম কিন্তু একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যকালে লাজুক ও উদাসীন প্রকৃতির বালক ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র তখন তাঁহার আর এক মূর্তি আমরা দেখিতে পাই। তখন তিনি লাজুক উদোমাদা নন। তখন তিনি বীর-বিক্রম সিংহ। সেবার গড়ের মাঠে Calcutta International Exhibition হইয়াছিল। সেই Exhibitionএ কয়েকজন পুরুষ-অভিভাবক-হীন মহিলাকে কয়েকটা দুরাচার ফিরিঙ্গী যুবক জঘন্য ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া জ্বালাতন করিতেছিল। সেখানে বাঙালী আরও অনেক ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুবান্ধবও ছিলেন কয়েকজন,—কিন্তু কেহই ওই অসহায়া মহিলাদের সম্মান বাঁচাইবার জন্য আগাইয়া গেলেন না। সবাই গা বাঁচাইয়া সরিয়া পড়িলেন। আগাইয়া গেলেন কেবল দ্বিজেন্দ্রলাল।[১৭] একাই তিনি একদল গুণ্ডা ফিরিঙ্গীদের সম্মুখীন হইয়া কেবল মাত্র ঘুষির জোরে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রাণ সংশয় করিয়া ফেলিলেন। অত জনের অবিশ্রাম প্রচণ্ড প্রহার নীরবে সর্বাঙ্গে পাতিয়া লইয়া, ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া হয়তো তিনি প্রাণ হারাইতেন যদি না সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন যুবক আসিয়া তাঁহাকে বাঁচাইতেন।[১৮]

(১৭) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৮২-৮৩-৮৪

(১৮) এই চিত্রটি শেলীর স্কুলজীবনের একটি চিত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শেলীর স্কুলের পালের গোদা ছাত্ররা মিলিয়া দল পাকাইয়া 'Shelley-bait' এর আয়োজন করিত।—'Some Scout would discover the strange lad reading poetry by the river side and at once gave the "view hallo." Shelley with his hair streaming on the wind would take flights accross the meadow, through the college cloisters, the Eton streets. Finally surrounded like a stag at bay, he would utter a prolonged and piercing shrick, while his tormentor would 'nail' him down with balls slimy with mud, ('Ariel' Pp12)

আর একবার ট্রামেও তিনি এক সাহেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সাহেবটা তাঁহাদের মাঝখানে কর্দমাক্ত বুট সুদ্ধ পা-টা তুলিয়া দিয়াছিল। সরাইয়া লইতে বলিলে—'নিগার' আখ্যায় অভিহিত করিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সাহেবের চরণখানি এক পদাঘাতে বেঞ্চি হইতে নীচে নামাইয়া দিলেন।[১৯] দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বে আত্মসম্মান বোধের আরও নানা নিদর্শন আছে। তিনি যে বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, পিতা-মাতা-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন যে প্রকারান্তরে আত্মসম্মানই ক্ষুণ্ণ করা, ইহা যে আত্মসম্মান-হানিকর এ প্রত্যয় এ বোধ তাঁহার বরাবর ছিল। তখন বিলাত যাওয়া একটা সৌভাগ্যজনক ব্যাপার ছিল, সকলের পক্ষে ইহা সহজ সাধ্যও ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল এম. এ. পরীক্ষায় ইংরাজীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যিনি প্রথম হইয়াছিলেন তিনি যখন বিলাত যাইতে অসম্মত হইলেন তখন দ্বিজেন্দ্রলালকেই ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সে বৃত্তি লইয়া বিলাতে গিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার প্রস্তাব করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তখনও ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছেন এবং একটা স্কুলে মাস্টারী করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন, 'আমার নিজের কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু আমার বাবা মা অনুমতি না দিলে আমি যাইতে পারিব না। সে অনুমতি সহজে পাওয়া যায় নাই। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র বুদ্ধিমান দূরদর্শী লোক ছিলেন, পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় তিনি অনুমতি দিলেন। কিন্তু প্রসন্নময়ী সহজে অনুমতি দেন নাই। অবশেষে তাঁহার অন্য পুত্রেরা যখন তাঁহাকে বুঝাইল যে বিলাত গেলে দ্বিজুর শরীরটা সারিয়া যাইবে তখন তিনি অনুমতি দিলেন। বিলাত যাত্রার আগের দিন রাত্রে মাতা-পুত্র গলা জড়াজড়ি করিয়া অনেক অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীকার সবিস্তারে এই করুণ দৃশ্যটির বর্ণনা করিয়াছেন।[২০]

(১৯) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৮৪

(২০) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৯৩

বিলাত হইতে ফিরিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল পিতামাতা কাহাকেও দেখিতে পান নাই। তাঁহার মর্মভেদী নিদারুণ শোকের বর্ণনা তাঁহার জীবনীকার দিয়াছেন।[২১] ইহাও দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ রূপ। হয়তো ইহা আত্মসম্মান বোধেরই আর একটা প্রকাশ। যে সত্তার সম্মান করিয়া আমরা মনুষ্যত্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হই সেই সত্তার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, যাঁহাদের প্রভাবে সেই সত্তা পুষ্ট ও বিকশিত হইয়াছে তাঁহাদের বিরহে শোক এবং আনন্দে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া আমরা আমাদের আত্মসম্মান বোধকেই ভাবাবেগে অর্চনা করি। যাহার আত্মসম্মান বোধ নাই, সে পশু, কোনও মহৎ কর্মে সে প্রেরণা পায় না, কোন কিছুই তাহাকে বিরাট ভাবে বিষণ্ণ বা উদ্দীপ্ত করে না। মিলটনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে করুন—"The pious and just honoring of ourselves may be thought the fountain-head from whence every laudable and worthy enterprise issues forth." বিরাট শোক, বিরাট আনন্দ, বিরাট আকাঙ্ক্ষা, বিরাট উচ্চাশা সবই laudable enterprise—সবই বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের প্রবল প্রকাশ। পত্নীর অকাল-মৃত্যুতেও দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার শোকাচ্ছন্ন এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাঁহার কাব্যসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। সামান্য একটু উদ্ধৃত করি—

"এই তো ছিল দেবী মূর্তি, আলাপ বিলাপ হাস্য রোদন
কর্ছিল তো কাছে
কোথায় গেল ? ফিরিয়ে দাও হে বিশ্বপতি, দাবী করছি
বল কোথায় আছে ?
এই সে ছিল গেল কোথায় ? দেখা হবে আবার, কিম্বা
এ চির-বিচ্ছেদ ?

(২১) দ্রষ্টব্যঃ—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ১৭৮ঃ পৃঃ ১৯৫

আমি পার্লাম না কো, তবে তুমি করে' দাও হে প্রভু
এ রহস্য-ভেদ।

* * * * * * * * *

—লুটে পুটে নিল
এমন সময় এসে কে গো আমার কুঁড়ে ঘরে
আগুন ধরিয়ে দিল
অমনি আমার কুঁড়ের সঙ্গে সোনার স্বপ্ন আমার
হয়ে গেল ছাই
গেছে, গেছে, সবই গেছে—উড়ে পুড়ে গেছে—
চিহ্নমাত্র নাই।[২২]

চারিদিক হইতে নানাভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি পুনরায় বিবাহ করেন নাই। সুরবালা দেবীর প্রতিই তিনি আমরণ তাঁহার প্রেমার্ঘ্য নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাতৃহারা ছেলেমেয়ে দুটিই তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহার প্রাণের আশ্রয় স্থল হইয়াছিল। অনেকেরই জীবনে পিতৃমাতৃশোক, পত্নীশোক আসে। অনেকেই সে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়েন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে এই শোক যে বিরাট বিশাল উদাত্ত গভীর মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। তাঁহার ব্যক্তিত্বে একটা গাঢ়-বদ্ধ উদার গম্ভীর অথচ পরিহাস,—কুশল স্বচ্ছতা দেখিতে পাই। প্রসঙ্গত আমার একটা ধারণার কথা উল্লেখ করি। দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে বক্তৃতাও করিতে পারিতেন।[২৩] ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁহার জ্ঞান প্রগাঢ় ছিল এবং

(২২) দ্রষ্টব্যঃ—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃ ২।

(২৩) দ্রষ্টব্যঃ—দ্বিজেন্দ্রলাল পৃ ৭।

উভয় সাহিত্যেরই তিনি 'ক্ল্যাসিক্যাল' সাহিত্যই পাঠ করিয়াছিলেন, যাহা মহাকালের বিচারে রসোত্তীর্ণ, চিরন্তন সারস্বত-সমাজে যাহা সমাদৃত, তাহাই তাঁহার প্রিয় ছিল। আমার মনে হয় ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের ভাষা ও ভাব তাঁহার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করিয়াছে।

ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের গম্ভীর সুসংস্কৃত ব্যঞ্জনাময় ভাষার ন্যায়ই তাঁহার ব্যক্তিত্বেরও মহিমা—জনসনের সেই কথাটি স্মরণ করাইয়া দেয়—'Language is the dress of thought।' আর 'থট্‌স' এর বহিঃ প্রকাশই তো ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যেও এই গুরুগম্ভীর উদার উদাত্ত ক্ল্যাসিক্যাল ভাব দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রতিভা-বলে নব-রূপ লাভ করিয়াছে। বন্ধুবর প্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন—"তাঁহার ভাষা না কি ধনুষ্টঙ্কারের ভাষা"। [২৪] কথাটা এক হিসাবে অতি সত্য। প্রতিভার ধনুকে ক্ল্যাসিক্যাল ভাবের জ্যা পরাইয়া তদানীন্তন সাহিত্যে সমাজে সত্যই একদা তিনি সব্যসাচীর ন্যায় টঙ্কার তুলিয়াছিলেন, যে টঙ্কারের রেশ আজও মিলাইয়া যায় নাই, বোধহয় কোন দিনই যাইবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বের আরও নানা খবর পাই তাঁহার বিলাতের পত্রগুলিতে। বিলাতের পত্রগুলি যখন তিনি লেখেন তখন তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই তাহার লিপি-কৌশল, তাঁহার বিদ্যাবত্তা, তাঁহার চিন্তার বহুমুখী প্রসার, তাঁহার ভাষা, তাঁহার রসিকতা আমাদের বিস্মিত করে। এই বিলাতের পত্রগুলিতে শুধু তাঁহার ব্যক্তিত্বের নানা নিদর্শনই বিধৃত হয় নাই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পূর্বাভাষও আছে—প্রত্যূষের উষারুণ-রঞ্জিত আকাশপটে যেমন উদীয়মান দিবসের আগমনী বার্তা লেখা থাকে, ওই বিলাতের পত্রগুলিতে তেমনি কবি, নাট্যকার, স্বদেশ-প্রেমিক, ব্যঙ্গকার, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-দীপ্তি আভাসিত হইয়াছে।

(২৪) দিলীপকুমার রায়ের পত্র

তাঁহার ব্যক্তিত্বের কয়েকটি নমুনা বিলাতের পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।[২৪]

প্রথমে জাহাজ যখন ছাড়িল—তখন তাঁহার মনের ভাব তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"কাতর-হৃদয়ে, সজল-নয়নে প্রেম-প্লাবিত অন্তরে যেদিকে ভারত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সেইদিকে চাহিয়া আমার জীবনের ধাত্রী, শৈশবের দোলা, ভালবাসার চির-পাত্রী ভারত জননীর নিকট বিদায় লইলাম"। জাহাজে কয়েকদিন পরেই সাহেব-দের সহিত তাঁহার খিটিমিটি বাধিল। লঙ্কায় যখন জাহাজ নোঙ্গর করে তখন লঙ্কার কোনও ফেরিওলা মুক্তা বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল—সে প্রথমে একটি মুক্তার দাম একশ টাকা চাহিল, পরে এক সাহেব অনেক দর-দস্তুর করিয়া তাহা দুই টাকাতে খরিদ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের দিকে চাহিয়া বলিল,—'These are worse than Calcutta shop-keepers. They come down only from Rs 50/- to Rs 3/- and not from Rupees Hundred to Rs 2/-.'—ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল জবাব দিয়াছিলেন,—'But they are better than English shop-keepers, for they would ask for Rs 100/- and would stick to it though the real price were Rs 2/-.'—বলা বাহুল্য সাহেব খুশি হইলেন না।

ধর্ম লইয়াও তর্ক হইয়াছিল কয়েকজন সাহেবের সঙ্গে। সাহেবরা ব্রাহ্মধর্মটা যে কিছুই না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—খৃষ্টধর্মই সত্য, কারণ পৃথিবীর সকল সভ্য ও পরাক্রান্ত জাতিই খৃষ্টান। যদি ব্রাহ্মধর্ম সত্য হইত তাহা হইলে সব সভ্যজাতি খৃষ্টান না হইয়া ব্রাহ্ম হইত অথবা ব্রাহ্মরা পরাক্রান্ত হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তর দিলেন—গ্রাক-রোমীয়-মুসলমান জাতিও এক সময় খুব পরাক্রান্ত ছিল, অতএব তাহাদের ধর্ম যে আদ্যন্ত সত্য ছিল

(২৪) দ্রষ্টব্য :—দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১০২-১০৩

তাহা প্রমাণ হয় না। পার্থিব বাহুবলের সহিত নৈসর্গিক ধর্মের কোন সংশ্রব নাই। একজন সাহেব বলিলেন—হিন্দু ধর্মটা মিথ্যা কারণ তাহারা পৌত্তলিক। দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিয়া উত্তর দিলেন—খৃষ্ট ধর্মটা খুব ভুল। সাহেব প্রশ্ন করিলেন—কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সেদিন যেন ব্যঙ্গ-হাস্য-কৌতুকের অকুতোভয় শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলালকেই দেখা গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"পরমেশ্বর ছয়দিনে জগৎ তৈয়ারি করিলেন কেন? একদিনেই তো পারিতেন। আর করিলেন তো একদিন আবার বিশ্রাম করেন কেন? পৃথিবীটা তৈয়ার করিতে কি বড় বেশি পরিশ্রম হইয়াছিল?" বলা বাহুল্য ইহা সাহেবের শ্রুতিসুখকর হয় নাই। ইলবার্ট বিল লইয়াও তর্ক হইয়াছিল একদিন।

সাহেব বলিলেন—"ইলবার্ট বিলে হিন্দুরা বড় মূর্খতা ও ধৃষ্টতা করিয়াছে।"

"কেন·

"আমরা ইংরেজ জাতি বাঙ্গালী হইতে বিভিন্ন। বাঙ্গালীদের কি অধিকার যে আমাদের দোষাদোষ বিচার করে?"

"ইংরেজের কি অধিকার যে বাঙ্গালীকে জয় করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করে? যাহাতে পরাক্রান্ত মনুষ্য দুর্বলকে অযথা পীড়ন করিতে না পারে ইহার জন্য যদি আইন-আদালত থাকে তবে পরাক্রান্ত জাতি দুর্বল জাতিকে যাহাতে পীড়ন করিতে না পারে ইহার জন্য কি আরও উচ্চতর আইন ও আদালত থাকা উচিত নয়?"

মনে রাখিবেন League of Nations বা U. N. এর কথা তখন স্বপ্নাতীত ছিল।

সাহেব বলিলেন—"তোমরা তিন-চারি বৎসর বিলাতে থাকিয়া আমাদের দেশের রীতি-নীতি কিছুই জানিতে পার নাই। আমাদের উপর বিচার করিবে কিরূপে?"

"আর তোমরা আমাদের রীতি-নীতি বোধহয় বিলাত হইতেই

দৈবশক্তিতে জানিতে পার এবং তাহার জন্যই আমাদের বিচার করিতে পার?"

"Two blacks make no white".

দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তর দিলেন,—"But two equal forces balance each other—"

মনে রাখিবেন সময়টা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। তখনও কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনও হয় নাই। আমাদের দেশের স্বদেশ-প্রেম ভ্রূণরূপে তখনও দেশের অন্তরে নিবদ্ধ। তাহার বহিঃপ্রকাশ বড় একটা হয় নাই। আর একজন সাহেব প্রশ্ন করিলেন—"তুমি তাহা হইলে Patriot?"

"না, আমি অত উচ্চ নামের যোগ্য নহি।"

সাহেব বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করি ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, আর এক জাতি আসিয়া বাঙালীকে ছিন্নভিন্ন করে, তাহারা যেরূপ ইংরেজ বিদ্বেষী সেইরূপ ফল পায়।"

দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তর দিলেন—"আমিও দেখিতে ইচ্ছা করি যে, ইংরেজেরা একবার ভারত হইতে চলিয়া গেলে···সাহেবেরা কিরূপে অনাহারে মরে—"

কয়েকদিন পরে দুই একজন সাহেব তাঁহাকে বাঙ্গালা গান গাহিতে অনুরোধ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, "আমি গাহিতে জানি, কিন্তু গাইব না। আপনারা বাঙ্গালা বোঝেন না, কেবল হাসিবেন। আমার গান আপনাদের হাস্যের বিষয় করিতে চাহি না।" আত্মসম্মানের এই প্রকার নমুনা তাঁহার জীবন চরিতের পাতায় পাতায়। বিলাত প্রবাসকালে, তাঁহার চাকুরী-জীবনে, তাঁহার সমাজ-জীবনে কোথাও তিনি নিজের আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। আত্ম-সম্মানের মেরুদণ্ডের উপরই যেন দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্ব বিধৃত হইয়া আছে। সে ব্যক্তিত্বের নানা রূপ, নানা রং, নানা ছন্দ কিন্তু সবারই ভিত্তিমূলে আছে তাঁহার আত্মসম্মান বোধ। বিলাত প্রবাসকালে তিনি সে

দেশের পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি, রীতি-নীতির সহিত স্বদেশের পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি ও রীতি-নীতির যে সব তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সমালোচক ব্যক্তিত্বেরও একটা পরিচয় পাই। তিনি স্বদেশের জিনিস মাত্রকেই যে ভালো বলিয়াছেন তাহা নয়, বিদেশের অনেক জিনিসেরও তিনি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ যে নিদারুণ দারিদ্র্যে অশিক্ষায়, কুসংস্কারে, পরাধীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত এ কথা তিনি একবারও বিস্মৃত হন নাই।

বিলাতে আসিবার সময়ে তাঁহার জাহাজ সুয়েজ বন্দরে প্রবেশ করিয়া অবশেষে যখন সায়েদবন্দরে নোঙ্গর করিল তখন একজন সহযাত্রী তীরে নামিয়া কতকগুলি 'ফটোগ্রাফ' সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল চিঠিতে সেগুলির নামকরণ করিয়াছেন—'সুয়েজ-কলঙ্ক ফটোগ্রাফ'। লিখিয়াছেন "মানুষের চরিত্র-মলিনতার বিভীষিকাময় চিত্র, পাশব প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অধোগমনের আদর্শ। মানুষ ইহার নিম্নে আর পতিত হইতে পারে না। আমি যেন কোথায় পড়িয়াছি বোধ হয় যে, তিনটিতে মানুষের প্রকৃতি জানা যায়। প্রথম পুস্তক, দ্বিতীয় সঙ্গী, তৃতীয় ছবি। মানুষ কি বই পড়ে, কাহার সঙ্গে বেড়ায় ও কি ছবি ঘরে রাখে ইহা দেখিয়া সে কি প্রকার মানুষ তাহা জানা যায়। যদি ছবি দেখিয়া জাতি ঠিক করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে সুয়েজবাসী অধঃপতিত অপবিত্রতার সীমান্ত। আর সুয়েজ দেখে ও পোর্ট সায়েদ দেখে যদি আফ্রিকার অবস্থা বিচার করা যায় তাহা হইলে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে নিকৃষ্টতম, অসভ্যতম, অপবিত্রতম। এই আফ্রিকাতে যে একদিন উজ্জ্বল, উন্নত, সভ্য মিসর ছিল—যেখানে একদিন গিরিবৎ স্থির ও তুঙ্গ পিরামিড নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না; বোধ হয় না যে হানিবাল-প্রসবিনী কার্থেজ একদিন এই আফ্রিকার কূলে গর্বে রোমের অদম্য শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া বিরাজ করিত; বোধ হয় না যে জগতের গৌরব পণ্ডিতগণের বাসভূমি আলেকজান্দ্রিয়া এই আফ্রিকাতে ফেনময় সিন্ধুর ক্রোড়ে

অবস্থিত—" এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া তিনি অবশেষে স্বদেশ-প্রেমের মহাসমুদ্রে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। লিখিতেছেন—"সুখী ভারত! তুমি এতদিন পরাধীন থাকিয়াও এতদূর পতিত হও নাই। কারণ আফ্রিকা যথার্থই আজ অসভ্য অজ্ঞান তিমিরাবৃত। ভারত! তুমি অত্যাচারের পীড়নের অধীনতার ক্রোড়ে পালিত হইয়াও এতদূর অধোগামী হও নাই। এখনও হিন্দুর আশার দিন আছে, উন্নতির উপায় আছে। হিন্দু! তুমি এখনও উন্নতমনা, এখনও অকলঙ্কিত-চরিত্র; কেবল এখন আর তুমি দেশের জন্য, ধর্মের জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পার না। তোমার সে অতুলনীয় বীরত্ব আর নাই।…"

স্বদেশের প্রসঙ্গে তিনি অতিশয়োক্তির সীমাও ছাড়াইয়া যাইতেন। জীবনে তিনি নানা স্থানে গিয়াছেন, নানা পরিস্থিতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, জীবন-সমুদ্রে তাঁহাকে বহুবার হাবুডুবু খাইতে হইয়াছে, অপ্রত্যাশিত নানা আঘাতে তিনি বারবার মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার স্বদেশ প্রেম, তাঁহার ন্যায়পরতা কোনও দিন অবনত হয় নাই। পারিপার্শ্বিক তাঁহাকে হয়তো প্রভাবিত করিয়াছে, কিন্তু গ্রাস করিতে পারে নাই। তাঁহার বংশগরিমা, তাঁহার পিতামাতার পুণ্যদীপ্তি নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও আমরণ তাঁহাকে দ্যুতিমান করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার জীবনচরিত্র পাঠ করিলে George Eliot-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে—'Breed is stronger than the pasture'।

দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসূচক আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। (ক) বিলাত প্রবাসকালে তিনি মহাকবি সেক্সপীয়রের জন্মস্থান কেনিলওয়ার্থ-নগর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানগুলি দর্শন করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন। অনেকেই হয়। কিন্তু তিনি বিলাতে কুকুর-প্রদর্শনী এবং চোর-সম্মিলনী দেখিতেও ভুলেন নাই। কুকুর প্রদর্শনীতে এক-জন ডাচেস একটি কুকুর পাঠাইয়াছিলেন তাহার দাম এক লক্ষ টাকা।

পাঁচ হাজার ছয় হাজার—সাধারণ ভালো কুকুরের দাম। বিলাতের পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন "আমাকে বিক্রয় করিলে কেহ একলক্ষ টাকা দেয় না? কবি টমাস হুড বলিয়াছেন

'Oh, God that bread should be so dear
And flesh and blood so cheap'

আমি বলিতে পারি—

Oh God that dog should be so dear
And human beings cheaps.[২৫]"

চোর-সম্মিলনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এ সম্মিলনীতে দেশের যত চোর তাহাদের একত্র করিয়া এক মহা-ভোজ দেওয়া হয়···যে যত চুরি করিয়াছে—সে তত অহঙ্কারী···যে কম জেল খাটিয়াছে তাহারই পরাজয়।

'অহো মনুষ্য, তোমার অধোগতি ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এখন দেখিতেছি, এমন বিষয় নাই যাহাতে পতিত অবস্থায় তুমি গৌরব করিতে পার না।···" [২৬]

(খ) দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে একজন বিদেশিনী মহিলার প্রণয়-জালে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। "মহিলাটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, বিদুষী এবং গ্রন্থাদি রচনা করিয়া তখনই সমাজে যশস্বিনী হইয়াছিলেন।"[২৭] দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে বলিয়াছেন একদিন একটি গোলাপ ফুল উপহার দেওয়া ছাড়া তিনি আর কখনও তাহাকে কোনরূপ প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু ওই গোলাপই শেষে প্রলাপ হইয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ সেই কুমারীটির পিতা দ্বিজেন্দ্রলালকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার কন্যাকে তিনি যদি বিবাহ করিতে সম্মত না হন তবে সে ভগ্ন-হৃদয়ে নিশ্চয়ই মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল

(২৫) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১৫৪
(২৬) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১৫৫
(২৭) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ১৯০

তো অবাক এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যদিও তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদে তখন শোকাচ্ছন্ন, যদিও তিনি তেমন প্রেমার্দ্র ও হন নাই, তবু তাঁহার মনে হইয়াছিল—আর সে শ্মশান-সম শূন্য স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া কি হইবে? এমন সুযোগ মিলিল যদি হেলায় হারাইও না'। অভিলাষটি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট অকপটে ব্যক্ত করিলেন। নৃত্যগোপাল বাবুই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন—"বিলাতী 'মেম' বা ম্যাম বিবাহ করিয়া ভারতবাসী কিছুতেই কোনদিন দাম্পত্যসুখের অধিকারী হইতে পারে না। উভয় জাতির চিন্তা, আদর্শ, স্বভাব ও আচরণের আদ্যোপান্ত আকাশ-পাতাল পার্থক্য ও বৈষম্য"। নৃত্যগোপালের চেষ্টায় দ্বিজেন্দ্রলাল এ আকাঙ্ক্ষা অবশেষে বর্জন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে এজন্য তিনি নৃত্যগোপাল বাবুর কাছে চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। নিজেই বলিয়াছেন—"নৃত্যগোপালের কাছে আমি যে কি অপরিসীম ঋণী তা' আমি একমুখে বলে' শেষ করতে পারি না। সে যে আমার কতবড় উপকার করেছিল তা আমার যত বয়স বাড়ছে ততই আমি সব রকমে বুঝতে পারছি। তার সে উপকার আমি মরে' গেলেও হয়ত ভুলতে পারব না।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক বন্ধুবর্গ একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাহার স্বজন-বান্ধব, এমন কি তরুণ বয়স্ক পুত্রকন্যার নিকটে পর্যন্ত দর্পভরে বলিতেন'— "বিলাতে আমার জীবন যে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কভাবে কেটেছে একথা আমি যেমন জোর করে' বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, খুব অল্প লোকই তেমন পারে—"

(গ) বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁহার অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় বলিয়াছেন— "তিনি দেশে আসিয়া ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নিজেকে অবনত না করিয়া ছোটলাটের সহিত যেরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্তা

কহিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ভাল চাকুরি পাইলেন না। তাঁহার ন্যায় কৃষি-কর্ম শিক্ষা করিয়া একজন বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী Statutory civilian হইলেন, আর দ্বিজেন্দ্র ডেপুটি হইলেন"।[২৮] তাঁহার স্বাধীন চিত্ততা, ন্যায়পরতা এবং স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি চাকুরী জীবনেও অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়াছেন। তবু সাহেব-মনিবদের পায়ের তলায় নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারেন নাই। সুজা-মুটার সেটলমেণ্ট অফিসার রূপে তিনি লাটসাহেবের সহিত সংঘর্ষেও পরাঙ্মুখ হন নাই, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কেস করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। এ তেজস্বিতা সে যুগের কর্তাভজা মনোবৃত্তির অন্ধকারে আজও অগ্নি-অক্ষরে লিখিত আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কখনও কিছু করিতেন না। বিলাত-ফেরত বলিয়া তাঁহাকে সামাজিক পীড়নের সম্মুখীনও হইতে হইয়াছিল। অনেক আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে অনেকে তাঁহাকে 'একঘরে' করিবার ভয় দেখাইলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ভয়ে ভীত হইবার পাত্র নন। বিলাতে থাকিবার সময় তিনি 'পতাকা' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—"অনেকেই সমাজ-চ্যুত হইবার ভয়ে ভীত। আমি জানিনা এ আশঙ্কার কারণ কি। সমাজ? কেন, প্রতি মনুষ্য লইয়াই তো সমাজ। সমাজ আমাকে চ্যুত করিবে? তাহাতে কি আমারই ক্ষতি কেবল? তাহার নহে? সমাজ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া হীনবল হইল না?···ক্রমশঃ নতুন সমাজ গঠিত হইবে নূতন ও সভ্যতর আচার অনুষ্ঠিত হইবে"।[২৯] অবশেষে সমাজ তাঁহাকে সত্যই 'একঘরে' করিল। ইহার ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল যে ব্যঙ্গশানিত অট্টহাস্য করিলেন তাহা তাঁহার বহু হাসির গানে এবং 'একঘরে' নামক পুস্তিকার পাতায় পাতায় আজও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 'একঘরে' হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি—

(২৮) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২০১

(২৯) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ২০৭

"কিন্তু আমরা যে একঘরে, এ একঘরেতে সাহসও নাই, কারণ ইহাতে শাস্তি নাই, বা কণামাত্র স্বার্থত্যাগ নাই। এ একঘরের একমাত্র স্বার্থত্যাগ কন্যার বিবাহে পাত্রের অসদ্ভাব। আমি তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে সব সমাজেই কন্যার বিবাহ হইতেছে। অর্থব্যয় করিলে জামাতার অভাব হয় না। আর তাহা হইলেও কন্যার বিবাহের জন্য যদি এত মিছাকথা, ভীরুতা, ও লুকোচুরি তো ইহার চেয়ে কন্যা চিরকাল অনূঢ়া থাকাও ভালো। এ একঘরের আর একটি আরামময় ভীতি যে ছেলের বিবাহে বা পৈতায় কেহ আমাদিগের সহিত খাইবে না। সুখী আমরা! আমরা পূর্ণান্তঃকরণে বলি 'তথাস্তু।' বলা বাহুল্য যে আমরা হিন্দুর ফলারের বা ভোজের পক্ষপাতী নহি। আমরা কোন হট্টগোলময়, ছিন্নকদলীপত্রময়, 'মহাশয় এ-পাতে নয়', গড়ায়িত ধধিময়, হারাইত চটিজুতাময়, হিন্দু ফলারে বা ভোজে খাইতে উচ্চাভিলাষী নহি"। ৩০

এই 'একঘরে'র বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রূপ তাঁহার হাসির গানেরও নানা স্থানে আছে।

তাঁহার বিখ্যাত 'বলি তো হাসব না' কবিতাটাই মনে করুন।

"যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে
প্রায়শ্চিত্ত করে
যবে কোন মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত
ধর্ম ভাঙে গড়ে
যবে কোন প্রবীন ষণ্ড মহাভণ্ড
পরেন হরির মালা
তখন ভাই হাসি ঢেকে নাহি ক্ষেপে
রইতে পারে কোন—
হা-হা-হা-হা—হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ।"

(৩০) দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী (সংসদ সংস্করণ) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬০৫-৬০৬

তাঁহার প্রতাপসিংহ নাটকে মানসিংহের মুখ দিয়া তিনি হিন্দু-ধর্মের 'শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের বিরুদ্ধে' যাহা বলাইয়াছেন তাহাও এই 'একঘরে' হওয়ার প্রতিক্রিয়া। তাঁহার ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রেও একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। তিনি মনে প্রাণে স্বদেশী হইলেও কিছুদিন বাহিরে 'পাক্কা' সাহেব হইয়া উঠিয়াছিলেন। যিনি লিখিয়াছিলেন,—"আমরা সাহেব সঙ্গে পটি, মিস্টার নামে রটি, যদি সাহেব না বলে 'বাবু' কেহ বললে মনে মনে ভারি চটি।" তিনি নিজেই একদিন মিস্টার নামে সমাজে নিজেকে পরিচিত করাইয়াছিলেন, বাবু বলিলে সত্যই মনে মনে চটিতেন, বাড়িতেও সাহেবী পোষাক পরিয়া থাকিতেন, টেবিলে খানা খাইতেন, গোসল খানায় স্নান করিতেন, পৈতাটা পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। যে সমাজ তাঁহাকে একঘরে করিয়াছিল প্রকাশ্যে সে সমাজের বিরুদ্ধ-আচরণ করিয়া তিনি যেন তাহাকে ঠাস ঠাস করিয়া চড়াইয়া গিয়াছেন। শ্বশুরবাড়িতেও অদ্ভুত সাহেবী পোশাকে গিয়া হাজির হইতেও তাঁহার বাধে নাই। প্রসাদ দাস গোস্বামীর একটি পত্রে দেখিতেছি :

"বিবাহের দু'একদিন পরে দ্বিজু সস্ত্রীক আমার সহোদরার সহিত (সুরবালার মাতামহীর) শ্রীরামপুরে আমার মাতা ঠাকুরাণী ও স্ত্রীকে প্রণাম করিতে যায়। সেদিন দ্বিজুর এক অপূর্ব হাস্যোদ্দীপক মূর্তি। আগাগোড়া লাল মখমলের পোশাক, ছোট প্যান্ট, হাফ্‌কোট, একটা গোরাই ধরণের ক্যাপ বা টুপি মাথায়"।[৩১]

সিভিল লিস্টে তাঁহার নামটা পর্যন্ত পরিবর্তিত রূপে প্রকাশিত হইত। তখন তাঁহার নাম ছিল মিস্টার দ্বিজেনলালা রে (Mr. Dwijen Lala Ray)। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ভাগলপুরে তাঁহার যখন আলাপ হয় তখন তিনি তাঁহাকে যে গান গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহা কোন স্বদেশী গান নহে। সে গানটির প্রথম

(৩১) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২২৭

দু'টি কলি এই—'She is a fisherman's daughter : And I'll marry her—'।[৩২]

'একঘরে' করার পর হইতে তিনি সমস্ত স্বদেশী আচরণের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চলনে বলনে, হাব-ভাবে, আচার-আচরণে সাহিত্যে ইহা জীবন্ত প্রতিবাদের মতো মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সাহেবীয়ানা এবং বাঙালীয়ানার একটা সমন্বয় প্রচেষ্টাও অনেক সময় হাস্যকর ভাবে তাঁহার বেশ ভূষায় ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। "শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী এ বিষয়ে একটি কৌতুকজনক বিবরণ দিয়াছেন। তখন গভর্ণমেণ্ট জরিপ-জমাবন্দীর কার্য শিখিবার জন্য তাঁহাকে রায়পুর জেলায় প্রেরণ করেন। প্রায় তিনমাস তিনি রায়পুরে ছিলেন।" শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী লিখিতেছেন—"সেখানে এক দরবার হয়। দ্বিজু সে দরবারে ধুতি, চাদর, লাল কোট ও বিলাতী হ্যাট পরিয়া হাজির হন। সকলে তাঁহার এই অদ্ভুত বেশ দেখিয়া তো অবাক। কমিশনার সাহেব…জিজ্ঞাসা করিলেন-লোকটা কি পাগল? নইলে এরূপ পোষাকের অর্থ কি!…বিলাতী ও দেশী পোষাক মিশাইয়া পরিয়া তিনি তদ্দারা এই দুই বিভিন্ন জাতির মিলনের পরিচয় দিতে চাহিয়াছিলেন…"[৩৩]

অর্থাৎ তিনি খেয়ালী মানুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ অসংখ্য ঘটনায় তাঁহার এই খেয়ালী চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। তিনি যাহা করিতেন তাহা সজোরে সদম্ভে কাহারও তোয়াক্কা না রাখিয়া, কে কি বলিতেছে সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া করিতেন। তিনি তাঁহার জীবনীকার দেবব্রত রায়চৌধুরীকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"এটা আমি নিজে বেশ বুঝতে পারি আমার এ ব্যর্থ

(৩২) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২২৬

(৩৩) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২০২

জীবনের যদি কিছুমাত্র বিশেষত্ব থাকে তা এক সোজা-কথায় 'কারো-তোয়াক্কা-রাখি-না-বাবা-তা" ।[৩৪]

তাঁহার জীবনের অনেক আপাত-অশোভন আচরণের মূলেও এই মনোভাব কাজ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু যে-ই তাঁহার মনে হইল যে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা অস্পষ্টতা-দোষে দুষ্ট, অনেক কবিতা লালসা-রসে-ক্লিন্ন, লোকেন পালিতের মতো মার্জিত-রুচি সাহিত্য-রসিকের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক করিয়াও তিনি যখন তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারিলেন না, তখন যাহা তাঁহার মনে হইয়াছিল তাহা তিনি একটি পত্রে দেবব্রতবাবুকে লিখিয়াছিলেন—"স্বয়ং পালিতের মতো বিজ্ঞ ও বিদ্বান লোকেরই যখন এই দশা তখন আর অন্যের কথা কি ? নব্য সাহিত্যিক ও কবির দল রবিবাবুর গুণের তো আর নাগাল পাবেন না কেবল এই সব নিকৃষ্ট স্টাইল ও আইডিয়ার অনুকরণ করে' ক্রমে আমাদের আরাধ্যা মাতৃভাষার মন্দিরে আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা জমিয়ে তুলবেন······ Honest Controversy-কে আমি বাঞ্ছনীয়ই মনে করি। কিন্তু কেউ যদি আমাকে এজন্য বিদ্বিষ্ট ভাবে সে কিন্তু বড়ই অন্যায় ও আক্ষেপের কথা হবে। কিন্তু greatest good to the greatest number হিসাবে আমার এ কাজটা কি মূলে অন্যায় ? আমার তো তা একটুও মনে হচ্ছে না······লোকমতকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। জীবনে এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত যা কখনও করলাম না আজ কিনা সেই লোকের নিন্দার ভয়ে হক্ কথা বলতে পিছু হটব ? তেমন কাপুরুষ শর্মা নন। হুঁঃ—ভারি তো আমার ভয়—ফুঃ—"

এই পত্রের ভাব ও ভাষাতেই দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের এই দিকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

---

(৩৪) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২০৩

দ্বিজেন্দ্র-ব্যক্তিত্বের এই দিকটার আর একটা বড় পরিচয় পাই যখন দেখি সে যুগে তিনি বেঙ্গল পার্টিশনের সমর্থন করিয়াছিলেন। দেশ সুদ্ধ লোক যখন লর্ড-কার্জন-কৃত বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিতেছে, সেই আন্দোলনের ফলে যখন পার্টিশন রদ হইবার উপক্রম হইল, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন— "partition-এর সময় আমি বলেছিলাম যে এর একটা খুব bright side (উজ্জ্বল দিক) আছে। তোমরা তো তখন আমার উপর খড়্গহস্তই ছিলে। সে ভালোর দিকটা এই যে একদিকে বাঙালীরা আসামীদের শিক্ষিত করুক, আর একদিকে বিহারীদের শিক্ষিত করুক। নইলে একা বাঙালীদের আর বল কতটুকু"।

কিছুদিন আগে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে যদি একতা রাখে পার্টিশনে তা ভাঙ্গিতে পারিবে না।

বাঙালীর আপনাদের মধ্যে একতা-স্থাপন করার পূর্বে তাহাদের মনের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব দূর করিতে হইবে। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা সাধিত হইবে না"।[৩৫]

বিলাতী জিনিস বয়কটেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন "আমি বলি এই বিদ্বেষমূলক বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতেই সম্ভব নয়"।[৩৬] ওই পত্রেরই আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"স্বাভাবিক মনের আবেগে যদি আমরা মাকে 'মা' বলিয়া পূজা না করি, যদি পরের দ্বারা অনাদৃত আহত না হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মাকে মর্যাদা দিতে না চাই, যদি আন্তরিক অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই মার দৈন্য ক্লেশ দূর করিতে না পারি, তবেই তো ভয়—বুঝিবা আমাদের এ পূজা

(৩৫) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩৯৬

(৩৬) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩৯২

আন্তরিক নহে ; তবেই তো ভয় হয়তো বা আমাদের এ অবস্থা ও ইচ্ছা স্থায়ী নয়, স্বাভাবিক নয়—এসব পদ্মদলের বারিবিন্দুসম চপল ও ক্ষণস্থায়ী।"[৩৭]

ওই একই ব্যক্তি কিন্তু একদিন 'বন্দেমাতরম্' গানের প্রবল আবর্তে ভাসিয়া গেলেন। তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন "দেখিলাম সংখ্যাতীত যুবকবৃন্দ—পরিধানে পাতবাস, হস্তে বিবিধ মন্ত্রাঙ্কিত গৈরিক পতাকা—দলবদ্ধ হইয়া সেই বিরাট প্রসেশানের পুরোভাগে মাতৃনাম গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন, আর সঙ্গে অগণ্য লোক মন্ত্রমুগ্ধ-চিত্তে সে মহাগীত-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহ-সমক্ষে আসিয়া (তাঁহাকে দেখিয়াই হৌক অথবা অন্য যে হেতুতেই হৌক) সহসা সেই অসংখ্য জনসঙ্ঘ সংক্ষুব্ধ ও গতিহীন হইয়া পড়িল। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল সে ভাব-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া একেবারেই প্রকাশ্য রাজপথে নামিয়া আসিয়া স্বয়ং সে গানে যোগদান করিলেন এবং ঊর্ধ্ববাহু হইয়া মেঘ-মন্দ্রবৎ মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে অকস্মাৎ অম্বর-তলে ভাব রোমাঞ্চ সঞ্চারিত করিয়া দিলেন"।[৩৮]

অথচ এই লোকই আন্তরিকতাহীন 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের চীৎকার সহ্য করিতে পারিতেন না, হুজুগে-মাতা শোভাযাত্রার উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন।[৩৯]

আপাত-বিপরীত এইরূপ অনেক আচরণ তাঁহার ব্যক্তিত্বে দেখা গিয়াছে, ইহার কারণ তিনি সরল, সত্যনিষ্ঠ, স্পষ্টবক্তা, তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। রাখিয়া ঢাকিয়া গা বাঁচাইয়া লোকের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া তিনি চলিতে শেখেন নাই। যখনই যাহা ন্যায়-সঙ্গত মনে হইয়াছে তাহা বলিয়াছেন এবং করিয়াছেন।

(৩৭) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩৯২
(৩৮) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৩৯৮
(৩৯) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৪৪৬

রবীন্দ্র-প্রতিভার তিনি একজন বড় গুণগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু যেখানে রবীন্দ্ররচনায় কোন দোষ দেখিয়াছেন তখনই তাহা স্পষ্টভাবে বলিতে ইতস্তত করেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বরিশালে বঙ্গ সাহিত্যের একটি সভা ডাকা হয়। সে সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি একটি পত্রে বলিতেছেন আমি যদিও রবিবাবুর ঐ সব লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠেই মানি যে বর্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না।···কিন্তু তবু শুধু এই সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি সম্বন্ধে যদি আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাক তাহা হইলে আমি বলি—শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু অথবা নবীনচন্দ্র সেনকে আগে সভাপতি করা উচিত ছিল। তিনি যত বড় সাহিত্যিকই হৌন না, ইঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার বয়স অল্প। সুতরাং ইঁহাদের দাবিকে অগ্রগণ্য না করায় আমার মতে অবিবেচনা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহই তো আর চিরজীবী নন। Seniority একেবারে অগ্রাহ্য করিতে নাই...তাছাড়া ইঁহাদের মধ্যে যোগ্যতায়ও কেহ তুচ্ছ নন-.”।[৪০]

দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্ট বক্তা, একরোখা, তোয়াক্কাহীন লোক ছিলেন বলিয়া যে সকলেরই অপ্রিয় ছিলেন তাহা নয়। বহু লোক তাঁহাকে ভালবাসিত। আড্ডাধারী লোক ছিলেন তিনি। ‘পূর্ণিমা-মিলন’-এর ইতিহাস তাঁহার ব্যক্তিত্বে আজও দীপ্ত হইয়া আছে। অনেক গুণ না থাকিলে আড্ডাধারী হওয়া যায় না। বন্ধুবর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহার ‘আরো আড্ডা’ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—“বর এবং কনে, দুটো মানুষ না থাকলে যেমন বিয়ে হয় না তেমনি আড্ডা বললেই দুটো বিশেষ

(৪০) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৪৪৯

মানুষের দরকার। আর সবাই বরযাত্রী। আড্ডার এই দুটি বিশেষ মানুষের মধ্যে একজন হলেন স্বয়ং আড্ডা-ধারী। আড্ডার সৌর-জগতে তিনি সূর্য। তাঁকে কেন্দ্র করেই আড্ডার চক্র ঘোরে।··· আড্ডার দ্বিতীয় বিশেষ লোকটি হলেন নাপিতের ক্ষুর শাণ দেবার জন্যে যে পাথর থাকে সেই শাণ-পাথর। এক এক আড্ডায় তাঁর এক এক রকম উপাধি। ···কোথাও তিনি মামা, কোথাও খুড়ো। হাসির ক্ষুর ভোঁতা হলেই তাঁর উপর শাণ দিয়ে নেওয়া হয়। আড্ডাধারীর মতো তিনিও আড্ডার অপরিহার্য অঙ্গ। এ ছাড়া প্রত্যেক আড্ডায় একজন কি দু'জন এমন লোক থাকেন কথামৃতের ভাষায় যাঁদের বলা যায়, রসদ-জোগানদার—আড্ডার মধ্যমণি। যে আঠায় আড্ডা জোড়া বেঁধে থেকে তাঁর মুখের কথায় থাকে সেই আঠা······" দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী হইতে তাঁহার আড্ডার যতটুকু খবর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা হইতে মনে হয় তিনি নানা আড্ডায় একাই উক্ত তিন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিতেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—"প্রকৃত আড্ডাধারীর একমাত্র বিশেষণ সে রসিক, সে ভদ্র, সে শিখেছে কি করে নিজেকে আড়াল রেখেও নিজের ব্যক্তিত্বকে সুন্দর ও অক্ষুণ্ন রাখা যায়।"[৪১]

দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহ বন্ধুবর্গের কাছে অবারিত-দ্বার ছিল। সে কালের বিদগ্ধ সমাজের তিনি একজন লোভনীয় এবং মাননীয় আড্ডাধারী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে হীরক-দ্যুতির নানা বর্ণ বিচ্ছুরিত হইত।

পরিশেষে দ্বিজেন্দ্রলাল-ব্যক্তিত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বিলাত-ফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইত ফিরিয়া কিছু দিন পাকা সাহেব হইয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ তাঁহাকে একঘরে করিয়াছিল, হিন্দুধর্মের নানা কুৎসিৎ গোঁড়ামি ও আচরণকে তিনিও

(৪১) দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃ; ১৪-২১

ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া মনে হয় মনে-প্রাণে তিনি বরাবর হিন্দুই ছিলেন। বিবাহ করিবার সময় তিনি অগ্রজদের সম্মতি লইয়া সাবেক হিন্দু নিয়ম অনুসারে হিন্দুমতে বিবাহ করিযা ছিলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপকুমারের যজ্ঞোপবীতের সময় দেবকুমারবাবুকে সোচ্ছ্বাসে তিনি বলিয়াছিলেন "ভেবেছিলাম এ জীবনে বুঝি কেবল ঐ একঘরে হয়েই কাটাতে হবে। কিন্তু আজ ভাই আমি একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করছি।······ যখন বৈদিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছিল আমার মনে এমনই একটা অস্থিরতা ও অনুতাপ এল যে তা' কি আর বলব। এসব অনুষ্ঠানের আচার ও মন্ত্রাদিতে কি যে একটা বৈদ্যুতিক পবিত্র প্রভাব আছে তা এর আগে আমি কখনও কল্পনাও কর্তে পারি নি। কি চমৎকার উপদেশ! কি অপূর্ব সব সুন্দর ব্যবস্থা। আমরা কি ছিলাম আর আজ এ কি হয়েই যাচ্ছি—কেবল যেন এই চিন্তাটা আজ আমাকে কশাঘাত করে' ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়ে তুলছে। আচ্ছা, আবার কি আমরা তেমন হব না ?"

তাঁহার বহু নাটকের বহু স্থানে বহু সঙ্গীতে তাহার এই হিন্দু-মনোভাবের উজ্জ্বল পরিচয় জাজ্বল্যমান হইয়া আছে।[৪২]

দেবকুমারবাবুকে লিখিত একটি পত্রে দেশ সম্বন্ধে যে কথা তিনি বলিয়াছেন তাহাও তাঁহার হিন্দুত্বের পরিচায়ক—

"আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব। এ আঁধার চিরদিন কখনও আমাদের ছেয়ে থাকবে না, থাকতে পারেনা। এ স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, অথবা প্রলাপ বা শূন্য অহঙ্কার নয়। "আসিবে সে দিন আসিবে"। আমি 'দেশ' চিনি না, বিদ্বেষ মানি না। আমি চাই শুধু ওই বীর্যবল—ব্রহ্মচর্য, চাই শুধু ওই সত্য-নিষ্ঠা, চাই শুধু আসল খাঁটি ধ্রুব ও নিটোল ধর্ম-বল, আর ঐ এককথায় মনুষ্যত্ব।"

(৪২) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৫৩৬

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বে ভারতের বিরাট আদর্শই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার প্রতিভা নানা বর্ণে নানা রূপে ওই আদর্শকেই রঞ্জিত করিয়া মহিমান্বিত করিয়াছে। প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও শিল্পী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই আদর্শ-স্বপ্ন বঙ্গবাণীর বিরাট চিত্রশালায় নানা-রূপকথালোক সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। সে রূপকথা লোকের রূপ-বৈভব তাই আজও অম্লান।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

কবি কাহাকে বলে এবং কবিত্বের প্রধান প্রধান লক্ষণ কি কি ইহা লইয়া চুল-চেরা তর্ক সর্বদেশের সাহিত্যে এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পর বিরোধী কোলাহল এমন তুমুল হইয়া পড়িয়াছে যে কেবলমাত্র তাঁহাদের আলোচনা পাঠ করিয়া কবি বা কবিত্ব সম্বন্ধে কোনও ধারণা করা যায় না। মনে হয় তাঁহারা এক-একটা বিশেষ মতবাদের চশমা পরিয়া সেই মতবাদটাই যে সত্য ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গলদঘর্ম হইয়া পড়িয়াছেন। কষ্টিপাথর কিন্তু কোন আলোচনা-আড়ম্বর না করিয়া নির্ভুলভাবে নির্দেশ করিতে পারে সোণা কি। রসিকের চিত্তও তেমনি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারে কবি কে। তাঁহার রসবোধের কম্পাস নির্ভুলভাবে নির্দেশ করে কোথায় কবিত্বের ধ্রুবতারা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কোন তর্ক, বিদ্যা-আস্ফালন অথবা আড়ম্বরের সাহায্যে তাহাকে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। সংস্কৃত আলঙ্কারিক সাহিত্যের রস-সম্বন্ধে একটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিলাতী গ্রন্থকাররা বড় বড় গ্রন্থ রচনা করিয়াও অমন স্পষ্টভাবে বলিতে পারেন নাই।

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ।

যাহা মনে সত্ত্বগুণের উদ্রেক করে, যাহা অখণ্ড অর্থাৎ দেশ-কালের গণ্ডী যাহাকে খণ্ডিত করিতে পারে না সর্বদেশে সর্বকালে যাহা রসিক চিত্তকে পুলকিত করে, যাহা আনন্দ-চিন্ময় অর্থাৎ যাহা আনন্দস্বরূপ যাহা জড়বস্তু নহে, যাহা বেদ্যান্তর স্পর্শ শূন্য অর্থাৎ যে রস আস্বাদন

করিবার সময় চিত্তকে অন্য কোন বেত্ত রস স্পর্শ করে না; যে রস আস্বাদন করিবার সময় রসিক তন্ময় আত্মহারা হইয়া পড়েন; যাহা ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর—অর্থাৎ যোগী, জ্ঞানী এবং ভক্তগণ যাহা অন্বেষণ করেন এবং আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হন—সাহিত্যের রস তাহারই সহোদর।

Vincent Buckley তাঁহার Poetry and Morality নামক পুস্তকে Matthew Arnold সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন—"......his basic position is quite simple : it is the notion that poetry is in some real sense, a religious act···He wants from poetry teaching and consolation and moral vitality : the teaching and consolation and moral energy which many others in his time, as in ours expected from religion." [১]

ম্যাথু আর্নল্ড আরও বলিয়াছেন—"More and more mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret life for us, to console us, to sustain us." অর্থাৎ আমাদের জীবনে ধর্মের যাহা ভূমিকা, কবিতারও তাহাই ভূমিকা। ধর্মের আচার-বিচার মাঝে মাঝে বদলায় কিন্তু কাব্যের আদর্শ অপরিবর্তনীয়। তাহা চিরন্তনের বাণী বহন করে, তাহার দ্যুতি শাশ্বতের আলোকে সমুজ্জ্বল। পৃথিবীর বড় বড় কবিরা যদিও স্বকীয় প্রতিভাবলে নিজের জগৎ, নিজের স্বর্গ সৃষ্টি করেন, সে জগতের সে স্বর্গের অনন্যতাই যদিও তাঁহাকে স্রষ্টার গৌরবে গৌরবান্বিত করে, তবু সব কবিরই শেষ-কথা জীবন-দর্শন জীবন-স্পর্শন, জীবনকে প্রতিভার অনুভূতিতে অলঙ্করণ এবং সর্বশেষে এমন একটা অপূর্ব

(১) Poetry and Morality by V. Buckley pp. 25-26

উপলব্ধি যাহা অনবদ্য। কবিতার উদ্দেশ্য শুধু বাসনা-কণ্ডুয়ন নিবৃত্ত করা নহে—তাহার কাজ নব-উপলব্ধির বার্তা বহন করা। সে উপলব্ধি প্রত্যেক কবির পৃথক, সে পার্থক্য উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে প্রত্যেক কবির বাচন-ভঙ্গীতে, লিপিকৌশলে এবং শব্দ-শিল্পে। T. S. Eliot তাঁহার On poetry and poets নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন —"I suppose it will be agreed, that every good poet, whether he be a great poet or not has something to give us besides pleasure : for if it were only pleasure the pleasure could not be of the highest kind. Beyond any specific intention which poetry may have, there is always the communication of some new experience or some fresh understanding of the familiar or the expression of something we have experienced but have no words for, which enlarges our consciousness or refines our sensibility"[২]

উদাহরণস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের 'সমুদ্রের প্রতি' এবং 'তাজমহল' কবিতা দুইটির উল্লেখ করিতে চাই। সমুদ্র এবং তাজমহল লইয়া অনেক বড় কবি অনেক উৎকৃষ্ট গম্ভীর কবিতা লিখিয়াছেন। সমুদ্র এবং তাজমহল লইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনবদ্য। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা দুইটি বিভিন্ন প্রকারের। বন্ধুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া লোকে যেমন আড্ডা দেয়, সমুদ্রের সঙ্গে তিনি তেমনি যেন আড্ডা দিয়াছেন এবং সেই আড্ডা দিতে দিতে এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা পাঠকের মনে 'some fresh understanding of the familiar or the expression of something we have experienced but have no words for'—এলিয়টের

(২) On Poetry and Poets—T.S. Eliot pp. 18

উক্ত বাক্যগুলির প্রতিধ্বনি জাগায়। তাজমহল কবিতাটিও নূতন ধরণের। কবির দৃষ্টিভঙ্গি কল্পনা-কিরণে তাজমহলকে যেন নূতন মাধুরী দান করিয়াছে। দুইটি কবিতাই বড় কবিতা। এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা যাইবে না। তবু 'তাজমহল' কবিতার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না।

…মৃত্যু কে বলে বিচ্ছেদ?
মৃত্যু এক প্রকাণ্ড বিবাহ, যাহে লুপ্ত বস্তুভেদ।
সে বিবাহে প্রদীপ জ্বলে না—সে বিবাহে
সুগন্ধ ফুলের মালা দোলে না তোরণে;
নেপথ্যে ওঠে না শঙ্খ হুলুধ্বনি তাহে;
নাহি জন-কোলাহল; সেই শুভক্ষণে
বাজে না মঙ্গল বাদ্য সুমধুর রবে,
সিংহদ্বারে। সে বিবাহ সম্পাদিত হয়
গাঢ় অন্ধকারে, ঘন স্তব্ধ নিরুৎসবে
যার সাক্ষী পরকাল মহাশূন্যময়।
যার পুরোহিত কাল—আশীর্বাদে তার
ব্যাপ্তি সহ মেশে সৃষ্টি, জ্যোতিঃ সহ মেশে অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথও মহাকাল বিলোচনকে বিবাহের বর-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। সে কবিতাও অপরূপ কবিতা। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার সুর অন্য, ভাবা অন্য, ছন্দ অন্য—এককথায় তাহা আর কাহারও মতো নয়—তাহা অনন্য। 'মন্দ্র' সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"মন্দ্র কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলীলা-কৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত

করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে"। মনকে তরঙ্গিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের একটি বিশিষ্ট গুণ। তাঁহার সরল বেপরোয়া অনন্য দৃষ্টি, তাঁহার ভাষার এবং মিলের নূতনত্ব আমাদিগকে সত্যই চকিত করিয়া দেয়। তাঁহার বেপরোয়া ভাব দেখিয়া সত্যই আমরা অবাক হইয়া যাই। উত্তুঙ্গ হিমালয়ের বিষয়ে কবিতা লিখিতে গিয়া তাহার সহিত ইয়ার্কি করিয়া তিনি তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া শুরু করিয়াছেন। পৃথিবীতে সবাই কর্মে ব্যস্ত, তুমিই কেবল ঘুমাইতেছ—?

"এ কি ঘুম বাপ, শুনিয়াছিলাম কুম্ভকর্ণ নামে ভীষণ
রক্ষ ছিল এক ; ছ'মাস করিয়া ঘুমাত সে রক্ষঃ কি সন।
তবু সে জাগিত একদিনও। তুমি, ইতিহাস যতদিনের
পাওয়া যায়, এই একই ভাবে আছ। শোন মিনতি এ দীনের
একবার জাগো! শুধু একবার—হে কুঁড়ের বাদশাহ
দেখি না অন্তত একবার ভুলে নয়ন তুলিয়া চাহ।"

ইহার উত্তরও তিনি হিমালয়ের মুখে দিয়াছেন :—

"এ সব কুঁড়েমি? এ বিশ্বের আমি লাগি না কি কোন কাজেই?
ফল শস্য কিছু পারি না ক দিতে, পুরাতে জীবের উদর ;
পড়ে আছি এক আলস্যের স্তূপ—কঠিন অনড় ভূধর?
তাহার উপরে অগ্ন্যুৎপাতে কভু বিশ্বের অনিষ্ট ঘটাই?
কিন্তু ব্যোম হতে গঙ্গা নামে যবে কে ধরিয়াছিল জটায়?
ব্যোমই সে বিষ্ণু আমিই ধূর্জটি, সে জটা আমারই শিখর
লতা গুল্মময়। সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র আদি নদ-নদী নিকর
আমিই বহাই না ক্ষেত্রে গ্রামে বনে? আমি অনুর্বর না হয়
কিন্তু সুশ্যামল ক্ষেত্র দেখ যত কে করে উর্বর তাহায়?

* * *

ধ্যানে নব সত্য আবিষ্কার করি, ধরণীরে নিত্য শেখাই
নিজে নিরানন্দ নিঃসঙ্গ পড়িয়া দূরে আছি একা একাই।"

এবং সর্বশেষে কবিতাটি শেষ করিতেছেন এই দুই ছত্রে—

"—কল্লোলিয়া যাক ঘটনার সম পদতলে জল-নিধি
তুমি থাক দৃঢ় দৃঢ় যেই মত আদি নিয়ম ও বিধি।"

তাঁহার অনেক কবিতারই আরম্ভ লঘু পরিহাসের সুরে, কিন্তু কবিতা যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে আর লঘুতা নাই, সেখানে তিনি গম্ভীর, আদর্শবাদী। অপ্রত্যাশিত গাম্ভীর্য ও করুণ রসে তাঁহার অনেক আপাতলঘু পরিহাস-প্রবণ কবিতার পরিসমাপ্তি। 'আলেখ্য' পুস্তকের বিবাহযাত্রী কবিতাটি মনে পড়িতেছে। তাহার আরম্ভটা এইরূপ—

"দেখলাম একটা যাচ্ছে বিয়ে সমারোহে রাস্তা দিয়ে
রাস্তার দুধারে চলেছে দুই এসেটেলিন ল্যাম্পের সারি
প্রথমত ঢোল ও কাঁশী তাহার পরে দক্ষ বাঁশী
তাহার পরে গোরার বাদ্য তাহার পরে সানাইদারি
বাঁশী সানাই ঢক্ক ঢোল কচ্ছে মিলে হট্টগোল
সবই আছে নাইক কেবল মৃদঙ্গ ও হরিবোল।
একটি যুবা সুগৌর হ্রস্ব চ'ড়ে একখান চতুরশ্ব
মন্দগতি 'ফেটিনাখ্য' যানে যাচ্ছেন সগৌরবে
অতি সুপ্রসন্ন মূর্তি পরণে তাঁর রেশমি কুর্তি
রেশমি ধুতি জরির টুপি—বয়স বছর পঁচিশ হবে
সুবিস্তৃত পরিসর যেন বিন্ধ্য মহীধর
কিম্বা ইন্দ্র ঐরাবতে; তিনি হচ্ছেন বিয়ের বর।

যে কবিতার শুরু এই সুরে সে কবিতার শেষের দিকে তিনি বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"হে কাম্য বিবাহ-যাত্রী! এই যে আলোকিত রাত্রি
এই যে যাত্রা সমারোহে দেখছ অদ্য সগৌরবে;
ভাবছ কি হে একদিন আবার (বটে সময় হ'লে যাবার)
একদিন আবার অন্য রকম সমারোহে যেতে হবে?

(তবে কি না সেটা ঠিক   নয়ক শ্বশুর বাড়ির দিক
    আলোক কিম্বা বাদ্যও তাতে থাকবে নাক সমধিক।)
সে দিন বিনা গণ্ডগোলে   (হুদ্দমুদ্দ হরিবোলে)
    মন্দগতি বাহক স্কন্ধে সোজা পথে চলে যাবে
(এমন সমারোহ আহা !   তুমিই দেখবে নাকো তাহা
    কিন্তু পথের অন্য সকল পথিক মাত্রেই দেখতে পাবে)
দেখবে তারা যাচ্ছে বেশ   নাইক কষ্ট দুঃখ লেশ
    কিন্তু যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের কষ্টের পরিশেষ।

*   *   *

হে কাম্য শকটারূঢ়   বলব না আজ সে নিগূঢ়
    সেই সে নিত্য সত্য রূঢ় !   তোমার সুখের রাত্রি হেন
তোমার সুখে সমুৎসাহে   কেবা বাধা দিতে চাহে
    তোমার পূর্ণ শরচ্চন্দ্র রাহুগ্রস্ত কর্ব কেন ?

যাও বিয়ে কর্তে যাও—   সে সব কথা ভেব না-ও
    অদ্য তোমার সুখের রাত্রি যত পার হেসে নাও।"

তাঁহার বহু কবিতায় এরূপ ভাব-বৈপরীত্য আছে। নানা পুষ্প সমন্বিত কাননের ন্যায় তাঁহার অনেক কবিতাতেই বহু ভাবের শোভা যুগপৎ বিকশিত হইয়া আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। ইহা দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছেন—"কাব্যে যে নয় রস আছে অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন—দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা মাধুর্য বিস্ময় কখন যে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই···"।

শুধু রসের ক্ষেত্রে নহে রসের বাহন ভাষা ছন্দ ও মিলের ব্যাপারেও দ্বিজেন্দ্রলাল অকুতোভয়। তাঁহার আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য বইগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় গদ্যের তেজী ঘোড়াকে ছন্দমিলের

বল্‌গায় বাঁধিয়া সাহিত্যের রাজপথে দুর্দম বেগে তিনি গাড়ি হাঁকাইতেছেন। গাড়ি মাঝে মাঝে বেসামাল হইয়া যাইতেছে, মাঝে মাঝে মনে হয় উলটাইয়া গেল বুঝি, কিন্তু উলটাইতেছে না, আবার সোজা হইয়া অপরূপ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সার্কাসে দেখিয়াছি ছাতা হাতে করিয়া সরু তারের উপর দিয়া একটি মেয়ে হাঁটিয়া চলিয়াছে, পড়ি-পড়ি করিয়াও পড়িতেছে না, গানের আসরে শুনিয়াছি বড় বড় ওস্তাদেরা সুরের নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি করিয়া শ্রোতাদের দিশাহারা করিয়া দিয়া—ঠিক সমে আসিয়া থামিতেছেন 'যমুনা কী তীর' বা 'বাজুবন্ধ খুলি খুলি যায়'—। এ-ও যেন অনেকটা সেইরূপ বিস্ময়। কবিতা ও গদ্যের অপূর্ব অদ্ভুত বিসদৃশ অথচ মনোহর রূপ। দ্বিজেন্দ্রলালের এ কৃতিত্ব অতুলনীয়। আলেখ্য কবিতা গ্রন্থ সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায় বলিয়াছেন "উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়—এ কবিতাগুলি যেন শুচি-শান্ত হিন্দু সংসারের মোটা রেশমী সুতায় বোনা লাল পেড়ে শাড়ি-পরা নিরাভরণা প্রৌঢ়া গৌরাঙ্গী গৃহলক্ষ্মী"। কিন্তু গৌরাঙ্গী গৃহলক্ষ্মীটি সব সময়ে শান্ত নন। মাঝে মাঝে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে চমকপ্রদ আভরণও পরিয়াছেন। প্রমাণ নর্তকী কবিতা।

'আলেখ্য' গ্রন্থের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের একটা পরিচয় পাই। আলেখ্য পুস্তকের ছন্দ আলোচনা শেষ করিয়া শেষে তিনি লিখিয়াছেন—

"তারপর ভাব। এইখানেই গোল। এখানে আমার বক্তব্যটি জোর ক'রে বলতে গেলে অনেক তর্ক-প্রিয় ও ব্যঙ্গ-প্রিয় ব্যক্তি তর্ক ও ব্যঙ্গ কর্বেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক বা ব্যঙ্গ করতে আমার আপত্তি নাই। তবে কোন বিশেষ কারণবশতঃ বঙ্গীয় মাসিক পত্রিকার এই লেখকদের সঙ্গে আমার তর্ক বা ব্যঙ্গ করবার প্রবৃত্তি নাই। সেইজন্য এই কবিতাগুলির ভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের নিজের নীরব থাকাই

ভালো। তবে এটুকু আমার স্বীকার করায় দোষ নাই যে এ পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোনও কবিতা পড়ে' তার মানে দশজনে দশরকম বের ক'রে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে ত একরকমই আছে। কোন কবিতার দুই একটি শ্লোক যদি বোঝা না যায় সেখানে আমি বলব সেটা আমার ভাষার দোষ। 'বৃহৎ' ভাব দাবী করব না…"

বলা বাহুল্য শেষের শ্লেষোক্তিটি রবীন্দ্রনাথের আবছা অস্পষ্ট mystic কবিতাকে লক্ষ্য করিয়া। যে আস্তিক্যবোধ, যে ভগবৎ ভক্তি থাকিলে মানুষ বুঝিতে পারে যে রহস্যময় অনুভূতিকে স্পষ্টরূপ দেওয়া যায় না, পরম ব্রহ্মকে অপরোক্ষ করিলেও বর্ণনা করা যায় না, সে আস্তিক্যবুদ্ধি সে ভাগবতী অনুভূতি দ্বিজেন্দ্রলালের কম ছিল। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই মনে করিতেন দ্বিজেন্দ্রলাল নাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনীকার দেবকুমারবাবু স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবতঃ কতকটা নিরাশাবাদী অর্থাৎ pessimist। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যভাবের দার্শনিক। তিনি তার্কিক ও যুক্তিবাদী।…এইজন্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া তাঁহার কবিতার স্থান উচ্চ নহে। তাঁহার কবিতা পাঠে সন্দেহ হয় তিনি Personal God মানিতেন না।…তাঁহার কবিতায় দেখা যায় তিনি স্বর্গ নরক ঈশ্বর দেবদেবী সম্বন্ধে বস্তুত বড় বেশী আস্থাবান ছিলেন না। ভাল-মন্দ…তিনি প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া দেখিতেন এবং প্রধানত তিনি পুরুষাকার ও নীতি মানিতেন।"[৩]

'গান'-এর কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর একটি পত্রে দেখিতেছি—"দ্বিজেন্দ্রের একদিনের তর্ক আমার মনে পড়ে। তখন তিনি ঘোরতর জড়বাদী। এ বিশ্বজগৎ নৈসর্গিক সৃজন বলিয়া তর্ক জুড়িলেন।

(৩) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৬৬৪

সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ২টা পর্যন্ত সে ঢেউ চলিল। তর্কযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের এমন সুযোগ দিতে, অতি কম লোকই তাঁহার মত পারে। দ্বিজেন্দ্র হাসিতে হাসিতে তর্ক শেষ করিলেন, কিন্তু সৃষ্টি-কর্তার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে রাজি হইলেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এইসব কথা শুনিয়াও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার কোন হ্রাস হইত না…" ৪

এই সব কারণেই হয়তো তিনি কবিতায় অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে বা 'মেয়েলি' ভাব সহ্য করিতে পারিতেন না। মনে রাধা-ভাব না জাগিলে কবিতায় প্রেমিকার আকুলতা ফোটানো যায় না। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় তিনি নিজেকে নারীর জবানীতে প্রকাশ করিয়াছেন। "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান"—"সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি, কি ঘুম তোরে ধরেছিল হতভাগিণী"—"মাগো, রাজার দুলাল চলি গেল মোর ঘরের সমুখ পথে, আমি বক্ষের হার না ফেলিয়া দিয়া রহিব বল কি মতে"—রবীন্দ্রকাব্য হইতে এরূপ অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। অন্তরে রহস্যময় অবর্ণনীয় আধ্যাত্মিক প্রেরণা না পাইয়াও রবীন্দ্র-অনুকারী অনেক কবি এই ধরণের কবিতা লিখিয়াছেন। আধ্যাত্মিক সুরের কবিতা লিখিয়া এদেশে সহজেই জনপ্রিয় হওয়া যায়। রাম-নামের জোরে মহাত্মা গান্ধী জাতির জনকপদে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জন-প্রিয়তার মোহ থাকিলে দ্বিজেন্দ্রলালও এইরূপ অজস্র কবিতা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার জীবনীকারের মতে—"ভগবদ্ভক্তির অল্পতাহেতু জাতীয় কবিতা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য কবিতাগুলি এদেশবাসীর হৃদয় তেমনভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই…"।৫

আমার মনে হয় এইখানেই দ্বিজেন্দ্রকাব্যের মহিমা। তাহা স্বকীয় মর্যাদায় স্বকীয় সৌন্দর্যে রসিক-চিত্তে চিরন্তন আসন অধিকার

(৪) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৬৮৮-৮৯
(৫) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৬৭০

করিয়া আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা সরল ঋজু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অকপট প্রকাশ। এই জন্যই তাঁহাকে দেখিয়া কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী লিখিয়াছেন—"মনে আছে অনেকদিন পরে একটি আদত মানুষের দেখা পাইয়াছিলাম। একটা সজীব প্রাণ! দেখিবামাত্রই মজিয়াছিলাম।"

এই অকপট সজীবতাই প্রতিভার স্পর্শে তাঁহার কাব্যকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ মানিক্যের মতো জ্যোতির্ময় করিয়াছে। রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল অনুপম অনন্যতায় রসিকচিত্তে শ্রদ্ধার আসনে মহামহিমায় বিরাজ করিতেছেন। আশাকরি চিরকাল করিবেন। জন-প্রিয়তা? দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য জন-প্রিয় নয় তাহা সত্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যই কি জন-প্রিয়? দ্বিজেন্দ্রযুগের অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন কি জন-প্রিয়? কেহ কি তাঁহাদের কথা মনে করিয়া রাখিয়াছেন? মাইকেল মধুসূদনের নামটাই অনেকের মনে আছে—তা-ও বোধহয় টেক্‌স্‌টবুক কমিটির অনুগ্রহে। তাঁহার কাব্য আজকাল কয়জন পড়ে?

"শিরে শূন্য পদে ভূমি মধ্যে আছি আমি তুমি
কল্প কল্প বিকাশ-বারতা!
আছে দেহ আছে ক্ষুধা আছে হৃদি—খুঁজি সুধা
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা!"

এ কবিতা যে অক্ষয়কুমার বড়ালের তাহা কয়টা লোক মনে করিয়া রাখিয়াছে!

"যাদুকরি, তুই এলি
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা-ভাষ্য—তোর ওই চক্ষু দীপিকায়
বিদ্যাপতি, মেঘদূত সব বোঝা যায়।
শব্দ হয় অর্থবান
ভাব হয় মূর্তিমান

রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায়
যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায় ?"

প্রেয়সীকে কাব্যশিক্ষার গুরু-রূপে যিনি এই কবিতায় অভিনন্দিত করিয়াছেন তিনি কে ? তাঁহার এ কবিতা পড়িয়াছেন কি ? না, অশোক-গুচ্ছের কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন আজ বিস্মৃতির কুয়াশায় হারাইয়া গিয়াছেন। হারাইয়া যাওয়াটাই নিয়ম। জনগণের হৃদয়-দুয়ার দুর্ভেদ্য। সেখানে বারবার অহরহ যুগযুগান্ত ধরিয়া আঘাত না করিলে তাহা খোলে না। অজ্ঞাত লেখকের লেখা ছড়া লোকের মনে বাঁচিয়া আছে। বাঁচিয়া আছে অসংখ্য বাউল গান, বৈষ্ণবের গান, অনেক পদাবলী। বাঁচিয়া আছে রামায়ণ, মহাভারত। ইহার কারণ কবি ও কথকরা এসব গান লোকের কাছে বার বার গাহিয়া গাহিয়া জনসাধারণের স্মরণপটে সেগুলি অমর বর্ণে আঁকিয়া দিয়াছে। লোকের মুখে মুখে যে কবিতার বার বার আবৃত্তি হয়, যে গান বার বার লোকের কর্ণপটহে সুরের বাজনা বাজায় তাহারাই জনপ্রিয় হয়। সিনেমার গান, রেকর্ডের গান, আবৃত্তি তাই জনপ্রিয়। বাধ্য হইয়া পড়িতে হয় বলিয়া পাঠ্যপুস্তকের কবিতাও বাঁচিয়া থাকে। পুরাকালে কবিতার সহিত গানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। এখনও বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে কবিরা কবিতা আবৃত্তি করেন না, গান করেন। কবি সভায় বা 'মুশয়রা'তে গানেরই প্রাধান্য, আবৃত্তির নয়। সেকালের গ্রাসে এবং ভারতবর্ষে ইলিয়াদ, অডিসি, রামায়ণ-মহাভারত বেদ-উপনিষদ সবই সুরের মাধ্যমে প্রচারিত হইত। জনগণের মন সুরেই বেশি সাড়া দেয়। অনেক প্রাচীন কবিতা এই সুরের জন্যই অমর হইয়া আছে, যদিও কবিতা হিসাবে অনেক সময় তাহারা উৎকৃষ্ট নয়। কবির প্রতিভা যখনই ছাপার হরফে বন্দী হইয়া গ্রন্থে নিবদ্ধ হইল তখনই তাহার মৃত্যু শুরু হইল। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক সাহিত্যের অধ্যাপক এবং Cambridge-এর কিংস কলেজের 'ফেলো' George Thomson লিখিতেছেন—"To most

English people English poetry is a closed book." কিন্তু Irish poetryর সম্বন্ধে একথা সত্য নয়। কারণ "For them poetry has nothing to do with books at all. Most of them are illiterate. It lives on their lips. It is their common property. Eevrybody knows it. Everybody loves it. It is constantly bubbling up in everyday conversation. And it is still creative…".৬ । রাশিয়াতেও তাই।

আমাদের দেশে যাত্রা থিয়েটার সিনেমার গান তাই লোকের মুখে মুখে বাঁচিয়া আছে। পুস্তকের কারাগারে বন্দী হইলেই কবির প্রতিভার অসীম দুর্দশা। প্রথমত গুদামের মালিক, প্রকাশক এবং দ্বিতীয়ত সমালোচক-প্রহরীদের পাল্লায় পড়িয়া তাঁহার নাকালের আর শেষ থাকে না। কেন জানিনা, মোহিতলাল মজুমদারের মত রসিক লোকও তাঁহার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালকে স্থান দেন নাই। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। তাঁহার কিছু ভালো কবিতাও আছে। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাকে মনে করিয়া রাখিয়াছে কি? কেহ কি তাঁহার কোন কবিতা মুখস্থ বলিতে পারে? পারে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলীর প্রথমভাগে যে ভূমিকাটি আছে (সম্ভবত সজনীকান্ত দাস এটি লিখিয়াছেন) তাহাতে দেখিতেছি—

"বাংলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-প্রতিভা যথাযথ সমাদর লাভ করে নাই। প্রথম ও প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তিতে সকলের চক্ষু এমনই ধাঁধিয়া গিয়াছিল যে আশে-পাশের অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধদীপ্তি জ্যোতিষ্কেরা সাধারণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দলের প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয়

(৬) Marxism and Poetry pp. 2

কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং ; তিনি স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্পর্কে যাহা অনুভব করিয়াছেন, অকপটে তাহাই বলিয়া ফেলিয়াছেন। অপ্রিয় সত্য বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, কাহারও সহিত আপোষ-মীমাংসায়ও তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি ঋজু মেরুদণ্ডের লোক ছিলেন, অত্যধিক নমনীয়তা বা ন্যাকামি মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না ; কঠোর হস্তে ইহার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের চাবুক চালাইয়াছেন, ফলে তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী অপবাদ দিয়া প্রায় 'একঘরে' করিয়াছে। 'আষাঢ়ে' 'মন্দ্র' 'আলেখ্য' ও হাসির গানের কবি প্রায় অপঠিত থাকিয়াই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন"।

ভূমিকাকার একটি কথা কিন্তু বিস্মৃত হইয়াছেন। কবি যদি সচেষ্ট হইয়া আত্মপ্রচারে বদ্ধপরিকর না হন তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবেই। ভাস্কর-দীপ্তি রবীন্দ্রনাথেরও বহু বিজ্ঞাপিত রচনাগুলি ছাড়া অন্য কোন রচনাকেই জনসাধারণ মনে করিয়া রাখে নাই। তাঁহার বিশাল সাহিত্যকীর্তির অধিকাংশই অপঠিত। নোবেল প্রাইজ না পাইলে রবীন্দ্রনাথের নামটাও বোধহয় লোকে এতদিনে ভুলিয়া যাইত। যে সব কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মতো স্পষ্ট-বক্তা আপোষ-বিমুখ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রিয় ছিলেন না, জনসাধারণ তাঁহাদেরও মনে রাখে নাই। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপমা দেবী—এ রকম অনেক নাম করিতে পারি—ইঁহাদের কথা জনসাধারণ ভুলিয়া গিয়াছে। সেদিন একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আবিষ্কার করিলাম যে 'সেঁজুতি' বলিয়া রবীন্দ্রনাথের যে একটি কাব্যগ্রন্থ আছে তাহার নাম পর্যন্ত তিনি শোনেন নাই। শুধু এদেশেই যে এরূপ অজ্ঞতা বর্তমান তাহা নয় বিলাতেও তাহাই। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম লণ্ডনে এদেশের একজন ভদ্রলোক রাস্তার একটি সাধারণ

লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'শেক্‌সপীয়রকে চেন?'—সে উত্তর দিয়াছিল—'না চিনি না, তবে কোন রাস্তায় কোন নম্বর বাড়িতে থাকে যদি বলিয়া দিতে পারেন তবে আপনাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারি'। এই সাধারণ লোকেরা চাকরি-ব্যবসা করে, সংসার-ধর্মে মশগুল হইয়া থাকে, থিয়েটার-সিনেমা দেখে, রাজনীতি লইয়া হুল্লোড় করে, পরনিন্দা পরচর্চা পরশ্রীকাতরতায় নিমগ্ন হইয়া থাকে। ইহাদের কাছে কবিরা সমাদৃত হইবে ইহা প্রত্যাশা করাই হাস্যকর। কোনও কারণে কাদার বাজারদর যদি বাড়িয়া যায় ইহারা চন্দন ফেলিয়া দলে দলে কাদার দিকেই দৌড়াইবে। অনেকদিন আগে আমি এ বিষয়ে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম।—খানিক উদ্ধৃত করি।

উদোর পিণ্ডির লাগি বুদো যেথা পেতে আছে ঘাড়
 অর্কফলা আন্দোলিয়া বৃথা সেথা শাস্ত্র-আলোচনা
বদ্ধপরিকর হ'য়ে সকলে দুহিবে যেথা ষাঁড়
 সুরভি কপিলা সেথা কেন করে বৃথা আনাগোনা।
অমৃত-রসিক বন্ধু খুঁজিও না তাড়ির দোকানে
 শূকর কাদাই চায়, চন্দনের মূল্য নাহি জানে।

চন্দন তবুও আছে এবং থাকিবে চিরকাল
 চন্দন-রসিকও আছে—হয়তো সংখ্যায় তারা কম—
গড্ডলিকা সম কভু হয় না তো রসিকের পাল
 সুরসিক বিধাতার অপরূপ এইতো নিয়ম।
তবু তাহাদেরই লাগি রূপলোকে আলো অনির্বাণ
 চিরশ্যাম কল্পলোকে মনোপাখী বাঁধে যেথা নীড়
রস-স্রষ্টা পায় সেথা রসিকের নিশ্চিত সন্ধান
 নাই সেথা কলরব, নাই সেথা গাদাগাদি ভীড়
 আলো সেথা চিরদীপ্ত তুচ্ছ করি তস্কর শ্বাপদ
 পেচক-প্রশংসা লাগি সে আলোক লালায়িত নয়

সত্যের ভাস্বর লোকে তার দীপ্তি চির নিরাপদ
অনির্ব্বাণ, আনন্দিত, স্বয়ম্প্রভ, শুদ্ধ জ্যোতির্ময়।
সে মিলন মহাতীর্থে আনন্দের বোধন সদাই
আছে শুধু শিব-উমা নন্দী-ভৃঙ্গীরা কেহ নাই।

এই মহাতীর্থে সমস্ত সার্থক রস-স্রষ্টা কবিদের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালও সগৌরবে সমাসীন। নন্দী-ভৃঙ্গীদের কাছে হয়তো তিনি পপুলার নন, কিন্তু শিব-উমার প্রসন্ন স্নেহদৃষ্টি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। যে কবিরা নন্দী-ভৃঙ্গীদের নিকট পপুলার হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন তাঁহাদেরই পতন হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল পপুলারিটির জন্য উন্মুখ হন নাই, ইহাতে তাঁহার স্বকীয় প্রতিভা সম্বন্ধে নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাও একটা বড় কবির লক্ষণ। তাঁহারা নিজ শক্তি সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন থাকেন এবং এই জন্যই তাঁহাকে অনেকে দাম্ভিক মনে করে। "আমি কারও তোয়াক্কা করি না বাবা" ইহা প্রায় সব প্রথম শ্রেণীর কবিরই মনোভাব। অবশ্য দুই একজন প্রথম শ্রেণীর কবি তোয়াক্কা করেন এবং সেজন্য তাঁহাদের অসীম দুর্দশা ভোগ করিতে হয়। কীট্‌স্‌কে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল।

কবিশেখর কালিদাস রায় দ্বিজেন্দ্রকাব্যসঞ্চয়ন গ্রন্থে—[৭] প্রাককথন শিরোনামায় দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভার যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা শুধু উচ্চাঙ্গের সমালোচনাই হয় নাই তাহাতে তাঁহার নিজেরও সূক্ষ্ম রস-বোধের প্রচুর নিদর্শন আছে। তিনি নিজে একজন বৃদ্ধ কবি, সেজন্য অতি সহজেই দ্বিজেন্দ্র-কাব্যজগতে প্রবেশ করিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-চমৎকারিত্বকে সহৃদয় শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

---

(৭) দ্বিজেন্দ্রকাব্যসঞ্চয়ন: শ্রীদিলীপকুমার রায় সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭

"দ্বিজেন্দ্রলালকে কোনো কবির শিষ্য বা অনুবর্তী বলা যায় না। তাঁর অনুবর্তী হয়ে হাসির গান কেউ কেউ লিখেছেন। কিন্তু অন্য রসের গান বা কবিতা কেউ লেখেন নি। কাজেই এ পথে তাঁর শিষ্য পরম্পরা নেই। তাঁর সমসাময়িক কবিদেরও কোন প্রভাব তাঁর রচনায় পড়ে নি। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি ছিলেন—"Like a star when only one is shining in the sky." কিম্বা—"He was like a star that dwelt apart।" আত্মচরিত্র, মানস প্রকৃতি, কাব্যাদর্শ, সেকালের সামাজিক চরিত্র ও আবেষ্টনীর সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর কবিতার গভীর সম্পর্ক আছে বলে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন তেজস্বী, সৎসাহসী, মার্জিতরুচি, অকপট, দেশভক্ত, স্বজাতিবৎসল, ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থাবান, আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষ। ...তৎকালীন সমাজে চারিদিকে কাপট্য, অসারল্য, অনাচার, অসংগতি, দাম্ভিকতা, ইতরতা, বাক্যের সহিত আচরণের অসামঞ্জস্য, পরানুচিকীর্ষা, স্বার্থের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জন ইত্যাদির অজস্র নিদর্শন দেখে তাঁর মনে যেমন বিতৃষ্ণার ভাব জেগেছিল তেমনি তাঁর দেশ-ভক্ত মনে ক্ষোভ ও আক্ষেপ জেগেছিল।

তিনি সমাজ-সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করলে ওসব নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন, সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়াতেন, নানা সংঘসমিতি করতেন। তিনি জন্মসিদ্ধ কবি, তাই কবিতা লিখেছেন।...রঙ্গাত্মক মনোভাব তাঁর সহজাত। নদীয়া অঞ্চলের রঙ্গরসাত্মক ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। এই মনোভাবের সঙ্গে অসত্যের প্রতি বিতৃষ্ণা-জাত ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের মিলনে তাঁর কবি-মনের পটভূমিকা রচিত হয়েছিল। তার ফলে বহু লিরিকজাতীয় নানা রসের কবিতাতেও রঙ্গব্যঙ্গের ছায়াপাত হয়েছে। বহু কারুণ্য রসের কবিতার মধ্যেও রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভাব অনুস্যূত হয়েছে—যেমন রাজপুত জাতির পরাধীনতার গভীর বেদনাও রঙ্গ-ব্যঙ্গের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রঙ্গব্যঙ্গের রচনা ছাড়া অন্য কবিতায় রসাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তাঁরই ভাষায় বলি—

কাব্য নয়ক ছন্দোবদ্ধ মিষ্ট শব্দের কথার হার
কাব্যে কবির হৃদয় নেই যার, তাহার কাব্য শব্দ সার।
যেথায় ভাস্বর যেথায় মূর্ত ঝঙ্কারিত কবির প্রাণ
উৎসারিত মহাপ্রীতি তাহাই কাব্য তাহাই গান।"

দ্বিজেন্দ্র কাব্যের মর্মকথা কবিশেখর কালিদাস রায়ের এই উক্তিতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। কবির কাব্যের সম্পূর্ণ রস কবিতা পাঠ না করিলে বোঝা যায় না। কিছু কিছু উদ্ধৃত করি

"যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকা ধারা
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্র তারা
দীপ্ত করি সে তিমির জাগে কাহার আননখানি
আমার কুটির-রাণী সে যে গো—আমার হৃদয়-রাণী

কিম্বা,

"পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনী, ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে
কত নগ-নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি চরণযুগ মাই
কত নর-নারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি

* * *

নারদ-কীর্তন-পুলকিত মাধব-বিগলিত-করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি ধূর্জটি-জটিলজটা-পর ঝরিয়া"

কিম্বা,

"বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ!

কিম্বা,

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি
বন্দিল সবে, জয় মা জননী, জগত্তারিণী জগদ্ধাত্রী
সদ্যঃস্নানসিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকর লিপ্ত
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল আনন দীপ্ত

* * *

জননী তোমার বক্ষে শান্তি কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি!"

কিম্বা ভৈরবীর এই গানটি—

"এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালবাসি—
এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায় ধরেনা ধরেনা তায়
আকুল অসীম প্রেম রাশি
তোমার হৃদয় খানি আমার হৃদয়ে আনি
রাখি না কেনই যত কাছে
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।"

কিম্বা—

"একি মধুর ছন্দ মধুর গন্ধ পবন মন্দ মন্থর
একি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জ মর্মর
একি নিখিল বিশ্ব হাসি
একি সুরভি স্নিগ্ধ শিশির সিক্ত কুসুম রাশি রাশি।

কিম্বা—

"দিন যায়, দিন আসে, নব অনুরাগে
আবার সে জাগে;

বসন্ত চলিয়া যায় মলয় বাতাসে
আবার সে আসে
ঘুম আসে ধীরে, ছেয়ে দুটি আঁখি পুটে
সেই ঘুমও টুটে
কিন্তু এক রাত্রি আসে ঘনাইয়া, তাহা চিরস্থায়ী
এক শীত আসে তার অবসান নাই
একটি প্রগাঢ় নিদ্রা আসে
আর ভাঙে না সে।"

কিম্বা—

"এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নব স্নিগ্ধ ঘনসম প্রিয়
এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে ঃ স্বর্গীয়
সুন্দর।
কভু ভাবি মনে
তুমি নও শীত
ধরণীর ;
কোন সূর্যালোক হ'তে এসেছিলে নেমে
এক বিন্দু কিরণ শিশির
শুধু গাথা—গীত
আলোক ও প্রেমে
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।
আগে যেন কোথা ভালো দেখেছি তোমারে
কোথা বল দেখি
মর্মর-প্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু—সে কি তুমি ?

অথবা সে
তুমিই দিব্যালোক আলোকি ছিলে কি
র‍্যাফেলের প্রাণে……"

দ্বিজেন্দ্রলালের এরূপ অসংখ্য কবিতা 'কেন' ভাল, অরসিককে তাহা যুক্তি দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। বধিরকে শত চেষ্টা করিয়াও সুরের মর্ম বুঝান যায় না, অন্ধের নিকট বহু বক্তৃতা করিয়াও বর্ণ মহিমা প্রত্যক্ষ করানো যায় না। যাঁহারা সমঝদার, যাঁহারা রসিক তাঁহারা ভালো কবিতা পাঠ করিবামাত্রই বুঝিতে পারেন কবিতাটি ভালো। কিন্তু আমাদের মধ্যে যেমন সবাই ডাক্তার, সবাই রাজনীতিজ্ঞ, তেমনি সবাই কাব্যরসিক। সকলেই মনে করেন তিনি কাব্যের সম্বন্ধে 'ফতোয়া' জারি করিবার অধিকারী। অনেক বণিক তাই বাণার কমল বনে ঢুকিয়া নিকষে কমল ঘষিয়া যাচাই করিতে চান কমলটা দামি কিনা এবং দামি হইলে কেন দামি। পাশ্চাত্য দেশ জড় বিজ্ঞান চর্চায় পারদর্শী এবং পারঙ্গম। অর্নিথোলজি, জুও-লজি, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তাঁহারা সন্ধানী আলোকপাত করিয়া পাখি প্রজাপতি পতঙ্গ ফুলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া জানিতে চাহিয়াছেন ইহাদের জীবনরহস্যের ব্যাপারটা কোথায় নিহিত। সুন্দর প্রজাপতি পাখি পতঙ্গ ফুলকে ডিসেকটিং টেবিলে চড়াইয়া তাহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়া তাঁহারা আমাদের কৌতূহলের খোরাক জোগাইয়াছেন। রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যায় এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে গিয়া তাঁহারা অবশেষে ভয়ঙ্কর 'এটম্ বম্'এ-র সম্মুখীন হইয়াছেন, কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত মানব-জাতিই এখন একটা মহাবিপদের ছায়াপাতে আতঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তাঁহারা কাব্যের ক্ষেত্রেও নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্লেষণ করিয়া জানিতে এবং জানাইতে চান কবিতা কি, কবিতা কোন গুণে কেন সুন্দর, কবিতার প্রাণ

-বস্তু কি, রস কাহাকে বলে, সৌন্দর্যই বা কি। Good poetry কাহাকে বলে, Great poetryই বা কি বস্তু, এসব লইয়া তাঁহারা বিস্তর বাগ্‌বিস্তার করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয় রস ও সৌন্দর্যের রহস্যকে তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই, নানা প্রবন্ধে নিজেদেরই তাঁহারা নানাভাবে আস্ফালন করিয়াছেন মাত্র। রস ও সৌন্দর্য অবর্ণনীয়, তাহা ব্রহ্মাস্বাদের মতো অনুভব যোগ্য, বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে বুঝানো অসম্ভব। সম্প্রতি Marjorie Boulton এর লেখা 'The Anatomy of poetry' পড়িলাম। মহিলা নিজে একজন কবি তাই আসল কথাটা বইয়ের গোড়াতেই বলিয়া ফেলিয়াছেন—'The things that are most interesting and most worth having are impossible to define. ...The fact that a man or woman deeply in love can find 'no words' is well known, though the attempt to find words has produced some of our greatest poetry'...কিন্তু সমালোচকরা সে কাব্যও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী সমালোচকদের অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় রূপ-রস-সাহিত্য-স্টাইল-কাব্যপাঠ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ তাঁহার সাহিত্যকথা গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন সেগুলি পাঠ করিলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী সমালোচকদের চিন্তার ধারাটা বুঝা যায়। Morjorie Boulton কবিতার বাহ্যিক রূপ, মানসিক রূপ, Rhythm, Phonetic Form, Mental Form প্রভৃতি নানারকম Form লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। মোহিতলাল মজুমদারের প্রবন্ধেও Form লইয়া অনেক আলোচনা আছে। তিনি Form-এর বাংলা করিয়াছেন রূপ এবং একটি অত্যন্ত খাঁটি কথা বলিয়াছেন। কাব্যের জড় উপাদানপুঞ্জই—তা সে যত মূল্যবান উপাদান হোক না কেন—তাহাই কাব্যকে রূপবান করিতে পারে না।

সাহিত্যের ছোট-বড় প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন ৮ "কোনও গ্রন্থের বিচারে সেই গ্রন্থের বিষয়টাই বড় নয়, কারণ সেইটাই তাহার জড় অংশ, লেখকের চিৎশক্তির প্রভাবে সেই জড়-উপাদান যে চিদ্-বস্তুতে পরিণত হইয়াছে তাহাই রচনার আসল রূপ!" অন্যত্র, "যেখানে বস্তু বস্তুত্ব হারাইয়া রসে পরিণত হইয়াছে তাহাই সাহিত্য-হিসাবে উৎকৃষ্ট রচনা"[৯] তিনি আর একটি প্রবন্ধে[১০] বলিতেছেন—"সাহিত্যের উৎকর্ষের প্রমাণ মৌলিকতা।…এ মৌলিকতা নূতন তথ্য-আবিষ্কার বা তত্ত্বচিন্তার মৌলিকতা নয়—ওই যে রচনা-রূপ বা styleএর কথা বলিয়াছি তাহারই মৌলিকতা। এ মৌলিকতার কারণ আর কিছুই নহে লেখকের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। লেখা পড়িবামাত্র বুঝিতে পারি—এ এক নূতন, সম্পূর্ণ অপরিচিত -পূর্ব ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হইতেছে; এ দৃষ্টি এ ভঙ্গী আর কোথায়ও নাই…"।

এই মানদণ্ডে বিচার করিলে দ্বিজেন্দ্রলাল একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। যেমন ধরুন কম্যুনিজম লইয়া অনেক বড় বড় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অপদার্থ ধনীদের বিরুদ্ধে পদদলিত নিষ্পিষ্ট দরিদ্রদের আক্রোশ লইয়া অনেকেই কাব্য-প্রবন্ধ নাটক-নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। সহৃদয় কবিমাত্রেই অসহায় দরিদ্রদের পক্ষে। দ্বিজেন্দ্রলালও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। কিন্তু তাঁহার 'আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থের ষোড়শ চিত্র 'রাজা' নামক কবিতাটি পড়ুন—

১

তোমার টাকা আছে? আছে না হয় টাকা
তোমার কাছে আমি কিছু চাচ্ছি নাক

(৮) সাহিত্য কথা: মোহিতলাল মজুমদার পৃঃ ৬৪

(৯) সাহিত্যে ছোট ও বড়—সাহিত্য কথা পৃঃ ৬৭

(১০) রস ও রূপ—সাহিত্য কথা পৃঃ ৭২

যে চায়, মাথা নীচু করুক তোমার কাছে
মাথা নীচু কর্তে আমি যাচ্ছি নাক।
কিসের তবে দর্প ? কিসের তবে গর্ব ?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো ?
তোমার কাছে আমি ভাবো কিসে খর্ব
তোমার কাছে মাথা নীচু করতে যাব ?

২

খাচ্ছ পোলাও তুমি ? খাও না, পোলাও খেয়ে
আমার চেয়ে তোমার বাড়েনিক ক্ষুধা
পোলাও তোমার কাছে নয় ক তেমন স্বাদু
যেমন এই শাকান্ন আমার কাছে সুধা।
শয়ন কর তুমি দুগ্ধফেননিভ
কোমল শয্যায় যদি পাখার বাতাস খেয়ে,
ছেঁড়া মাদুর পেতে আমি ঘুমাই যদি
—তোমার নিদ্রা নয়ক গভীর আমার চেয়ে।
জুড়ি হাঁকাও তুমি আমি যাচ্ছি হেঁটে
আমার পানে তাইতে চেয়ো নাক নীচু
ত্রিতল হর্ম্য তোমার মার্বেল মোড়া যদি
আমার কুঁড়ের চেয়ে ধন্য নয় সে কিছু।
তোমায় পঙ্গুর মতো যাচ্ছে টেনে নিয়ে
আমি হেঁটে যাচ্ছি নিজের পায়ের জোরে
তোমার প্রাসাদ ভবন সেও পরের দেওয়া
আমার কুঁড়েখানি—নিজের গায়ের জোরে।
তোমার হস্ত দু'খান প্রজার রক্তে মাখা
তোমার শরীর সে-ও পুষ্ট পরের খেয়ে
তোমার মাথা—যদি মাথা বল তাকে—
নয়ক বেশী কিছু পশুর মাথার চেয়ে।

কিসের তরে দর্প ? কিসের তরে গর্ব ?
কিসের জন্য তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাবো
তোমার চেয়ে আমি ভাবো কি সে খর্ব
তোমার কাছে মাথা নীচু কর্তে যাব।

৩

ওরে ও ভাই চাষী, ওরে ও ভাই তাঁতী
পড়িস নাকো নুয়ে ; জানিস এ সব ফাঁকি
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে
কর্বে তোদের উপর রক্তবর্ণ আঁখি ?
সারিবদ্ধ হয়ে একবার মাথা তুলে
দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজা ভাবে
দেখবি এই যে দম্ভ, দেখবি এই যে দর্প
দেখবি এই যে স্পর্ধা—চূর্ণ হয়ে যাবে।
উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষ যদি তোরা—
এদের সামনে কেন মাথা নুয়ে যাবি ?
সমস্বরে বল—এই সকলেরই মাটি
কারো চেয়ে কারো বেশী নাইক দাবী।"

এ কবিতা লেখা হইয়াছিল U. S. S. R. প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আলেখ্য প্রথম প্রকাশিত হয়। বড় কবিদের ব্যক্তিত্ব এক-রঙা নয়। তাঁহাদের কল্পনার বিভিন্ন উল্লাসে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব এবং কবিত্ব অনুরঞ্জিত হয়। তাঁহাদের বীণায় তাই নিত্য নূতন সুর বাজে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়[১১] "অনুভূতির বৈচিত্র্য পরম্পরা লইয়া চৈতন্য চিৎপ্রবাহ" এবং কবির এই চিৎ-প্রবাহ আরও বিচিত্র এবং ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। তাই যে কবি উক্ত কবিতা লিখিয়াছেন সেই কবিই আবার ভিন্ন ভিন্ন সুরে নানা কবিতা লিখিয়াছেন : দুই একটা উদ্ধৃত করি

(১১) সৌন্দর্য-তত্ত্ব রামেন্দ্র-গ্রন্থাবলী পরিষৎ সংস্করণ পৃঃ ১৮৩

গোধূলি

সূর্য অস্ত গেল। দিবার শুভ্র আলোক অন্ধকার লেগে
ভেঙ্গে গেছে। চূর্ণ হ'য়ে ক্ষিপ্ত হ'য়ে যেন একটা ঝড়ে ;
শুয়ে আছে বর্ণগুলি চারিধারে—আকাশে ও মেঘে।
যেন একটা বর্ণ-সৈন্য ঘুমিয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে ;
যেমন একটা মহানদী বহে গিয়ে পূর্ণ খর-বেগে
শেষে শাখায় উপশাখায় ছড়িয়ে পড়ে মন্দীভূত তেজে
যেমন একটা মহাগীতি মহাতানে মহাচ্ছন্দে জেগে
ছড়িয়ে পড়ে বিকম্পিত শত ভগ্ন মূর্ছনাতে বেজে।
সূর্য অস্ত গেল। বিশ্ব ঘেরে এল কৃষ্ণ সুপ্তি নেমে
মিশিয়ে গেল মহানদী সিন্ধুজলে, গীতি গেল থেমে।
[ত্রিবেণী : দশপদী কবিতা]

নবদ্বীপ

বঙ্গের গৌরব এই নবদ্বীপ পুর
বঙ্গের কলঙ্ক এই নবদ্বীপ। দূর
করি সে কলঙ্ক, ধৌত করি সে অখ্যাতি,
লজ্জার পুরীষপঙ্ক হইতে এ জাতি
উঠাইয়া স্ববলে, প্রেমহীন, সামান্য অসার
ক্ষুদ্র চিত্তে, জাগাইয়া ছিলেন মহতী
আশা ও সান্ত্বনা।—হেথা সেই মহামতি
মাতিয়া ছিলেন প্রভু, মানবের হিতে
প্রমত্ত উদ্দাম এক প্রেমের সঙ্গীতে।
অবিশ্বাস করিবেন ? এই ক্ষুদ্র স্থান
নদীতীরে কাঁচাপাকা বাড়ি কয় খান
অধিকাংশ চালা ঘর! ময়লার খনি
শীর্ণ গলি। ওই সব মিষ্টান্ন বিপণি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানেতে বিলাতি দ্রব্য ঘটা
লণ্ঠন (তাহার মধ্যে হিংক্‌সেরও ক'টা)
* * *
পমেটম, নানাবিধ ফিতের প্যাকেট,
আর সর্বনাশ—কুলবালার জ্যাকেট
* * *
গৃহাঙ্গণে 'কোপি', আরো দুই এক ঘরে
হরি হরি—এ কি দেখি—মুরগীও চরে।
* * *
সত্য বটে ; কিন্তু প্রিয়ে তবু সত্য এই,
এই সেই নবদ্বীপধাম এই সেই তীর্থভূমি চিরস্মরণীয়,
পঙ্কিল পবিত্র কুৎসিত সুন্দর, প্রিয়
অক্ষয় স্মৃতির মঠ, চির অভিরাম।
—প্রেমের জনমক্ষেত্র—নবদ্বীপ ধাম।

তবু এই সেই নবদ্বীপ ; ধৌত করে
সেই গঙ্গা, সে জলাঙ্গী, আজও ভক্তিভরে
তার পদ রজ। প্রিয়ে, শিরে লও তুলি,
প্রেমে সুপবিত্র আজও তার স্বর্ণধূলি ;
হোক সে পঙ্কিল আজি, বিলুপ্ত বিভব
বিহীন-সৌন্দর্য-জ্ঞান-প্রতিভা গৌরব,
তবু চিরপুণ্যময় তাহা—স্বর্গসম
অবনত কর শির—প্রেয়সি, প্রণম।

এই কবিতাটি দীর্ঘ : আমি মাঝে মাঝে বাদ দিয়া উদ্ধৃত করিলাম। সম্পূর্ণ কবিতাটি পাঠ করিলে রসিক পাঠক পুলকিত হইবেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-ব্যক্তিত্বের আর একটা রূপ দেখিতে পাইবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যে সম্ভবত আস্তিক্য-বুদ্ধি-সম্পন্নই ছিলেন

এই সব কবিতাই তাহার প্রমাণ। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তি করিতে পারেন, প্রেমকে যিনি জীবনের মহামূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য করেন তিনি যে নাস্তিক ছিলেন তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু একটা কবিতায় তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন :—সে কবিতাটি 'আলেখ্য' পুস্তকের দশম চিত্র 'বিধবা'। খুব বড় কবিতা। পূর্ণিমার গভীর রাত্রে চতুর্দিক স্বপ্নাতুর।

এমন সময়, শূন্য ঘরে
কেগো তুমি ভূমি পরে
  ব'সে মুক্ত বাতায়নের মূলে ?
একাকিনী আছ চেয়ে
কে তুমি সুন্দরী মেয়ে
  স্রস্ত বসন, স্রস্ত এলোচুলে ?
ছড়িয়ে দুটি রাঙ্গা পায়ে
হেলান দিয়ে কবাট গায়ে
  মরাল-গ্রীবা বাঁকিয়ে বাইরের দিকে।

* * *

আকাশ সুনীল ধরা শ্যামা
কিছুই তুমি দেখছ না মা
  দেখছ বসে বাতায়নের ধারে
জীবন-গ্রন্থখানি খুলি
অতীত কালের পৃষ্ঠাগুলি
  উল্টে পাল্টে তাহাই বারে বারে।

সে গ্রন্থে কত সুখের, কত দুঃখের, কত আশার, কত স্মৃতির, কত উন্মুখ বাসনার ছবি—'মনে পড়ে প্রাণের কথা নানা।' বারবার মনে হইল তাহার সুখের দিন শেষ হইয়াছে—'তার সঙ্গে আর হবে নাক দেখা'। দুই বৎসরেই জীবনের সুখ-স্বর্গ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে—'তার সঙ্গে আর হবে নাক দেখা'—। কবি বলিতেছেন,—

"যত আছে নিগূঢ় তথ্য
এর চেয়ে নয় কিছু সত্য
যেটা আজি দেখছ ব'সে তুমি।
যতখানি হেঁটে যাচ্ছ
যতখানি দেখতে পাচ্ছ
ধূ ধূ করছে জীবন মরুভূমি।
মহাশূন্য দগ্ধ সে যে
জ্বলছে অন্ধ-কারী তেজে
অগ্নি নিয়ে করছে খেলা বায়ু
নাইক বারি নাইক তরু
কেবল বালু, কেবল মরু
—শুষ্ক তপ্ত দীর্ঘ পরমায়ু।

৬

রাত্রি গভীর হ'তে গভীর!
পট-প্রান্তে বিশ্ব ছবির
জ্যোৎস্না-লেখা মুছে গেল ধীরে
অলস হ'য়ে এল আঁখি
গরাদেতেই মাথা রাখি
ঘুমিয়ে পড়ল আমার জননী রে।"

এই করুণ ছবি দেখিয়া কবির মনে সন্দেহ জাগিল। সত্যই কি ভগবান বলিয়া কেহ আছেন? সত্যই কি তিনি করুণাময়? মনে নাস্তিকতা জাগিয়া উঠিল—

"হায়রে মানুষ, বিধির কৃত্য
চোখের সামনে দেখছি নিত্য
তবু আমরা চক্ষু বুজে থাকি
খোসামোদের মন্দির খুলে

মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে
উচ্চৈঃস্বরে দয়াল বলে' ডাকি।"

এই কবিতা যিনি লিখিয়াছেন তিনিই আবার নৃত্যপরা নর্তকীদের মুখে এই গান গাহিয়াছেন—,

"আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে—
নিয়ে এই হাসি রূপ গান
আজি আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে
তোমায় করিতে সব দান।
* * *
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন-সৌরভ
ভেসে আসে উচ্ছল জলদলকলরব
ভেসে আসে রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি
ভেসে আসে পাপিয়ার তান।
আজি এমন চাঁদের আলো মরি যদি সে-ও ভালো
সে মরণ স্বরগ-সমান।"

এই একই কবি লিখিয়াছেন······

"ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র।
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র!
দিয়াছ মানবে জগজ্জননী দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা,
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম ভক্তি ধর্ম শিক্ষা।
* * *
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ'পরে আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে' দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী!
কর্মজ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

দ্বিজেন্দ্রলালই এ ধরণের ছন্দ বঙ্গভাষায় প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং এ ছন্দের গুরু-গম্ভীর মহিমায় আমরা আজও মুগ্ধ হইয়া আছি। অনেক কবি এ ছন্দের সার্থক অনুকরণও করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা নানা মেজাজের, নানা রূপের, নানা বর্ণের, নানা ছন্দের। সবই সৌন্দর্যময়। কিন্তু দার্শনিকদের মতে এ সৌন্দর্য খণ্ডসৌন্দর্য। মহামান্য পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ তাঁহার 'সাহিত্য-চিন্তা' গ্রন্থে 'রস ও সৌন্দর্য' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন —"পূর্ণ সৌন্দর্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, তাহাকে অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। বৃত্তি দ্বারা যে সৌন্দর্যের আভাস ফোটে—তাহা সাপেক্ষ, পরতন্ত্র, ক্রমবৃদ্ধিশীল, কালান্তর্গত। পূর্ণ সৌন্দর্য ইহার বিপরীত। এই পূর্ণ সৌন্দর্যের ছায়া ধরিয়াই খণ্ড সৌন্দর্যের আত্মপ্রকাশ"।[১২] কাব্যে এই খণ্ড সৌন্দর্যই প্রতিভাত হয়। কবির চিত্ত ও কল্পনা পরিবেশের প্রভাবে নানাবর্ণে রঞ্জিত হয়। কবিরাজ মহাশয়ের ভাষায় এগুলি আগন্তুক কারণ। "স্ফটিক সন্নিধানে নীলবর্ণের স্থিতিতে স্ফটিকে নীলাভাষ হয়, পীতবর্ণে পীতাভাষ হয়"।[১৩] কবিরাজ মহাশয়ের থিয়োরি "—কো হ্যন্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদ্যেষ আকাশ আনন্দ ন স্যাৎ"। রসই সার—রসই সত্ত্ব। রসের লোভে সকলেই চঞ্চল। রস ভিন্ন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। যাহার আস্বাদন হয় নাই, তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। রসের জন্য জগৎ পাগল, সুতরাং তাহার অনুভূতি একদিন কোথাও অবশ্যই হইয়াছে। নিশ্চয়ই একদিন সমস্ত জগৎ সেই রসপানে মাতোয়ারা হইয়া আত্মহারা হইয়াছিল, পরে নিয়তির প্রেরণায় সে অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জগৎ আজ তাহারই পুনঃপ্রাপ্তির

(১২) সাহিত্য-চিন্তা পৃষ্ঠা—২

(১৩) সাহিত্য-চিন্তা পৃষ্ঠা—৬

আশায় মণিহারা ফণীর ন্যায় অশান্তভাবে ছুটিতেছে—"।[১৪] কবিরাও এই মণিহারা ফণীর দল।

দ্বিজেন্দ্রলাল ঝিঁঝিঁট খাম্বাজে অভিমানভরে আলাপ করিতেছেন—

"আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি
ফিরে দেখা পাই আর না পাই
দূরে থাকো, কাছে থাকো মনে রাখ নাহি রাখ
আর কিছু চাহি নাক' আর কোনও সাধ নাহি
আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি।
অবহেলা অপমান বুক পেতে লব, প্রাণ!
ভালবেসেছিলে জানি, মনে শুধু রবে তাই
আমি তবু তা লাগি নিশি নিশি রব জাগি
এমনই যুগ যুগ জনম জনম বাহি।
আমি রব চিরদিন তব পথ চাহি—"

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"জ্যোৎস্না নিশীথে পূর্ণ শশীতে
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায় লখিতে?
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি দিলে কি!"

আরও অনেক কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখানো যাইতে পারে যে, সব কবিরাই মণিহারা ফণা। সকলেই অশান্তভাবে মণিটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, খোঁজার ধরণটা কেবল প্রত্যেকের আলাদা। বিশ্বের টুকরা টুকরা রং, রস, রূপ, ছন্দ, গন্ধ, আনন্দ আমাদের কেবলই সেই অনন্ত রং-রস-রূপ-ছন্দ-গন্ধ-আনন্দের অফুরন্ত উৎসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। Robert Frost-এর একটি ছোট কবিতা আছে—Fragmentary Blue। সে কবিতায় তিনি বলিতেছেন, মাথার উপর যখন অনন্ত নীলাকাশ তখন টুকরা টুকরা

(১৪) সাহিত্য-চিন্তা পৃষ্ঠা—১

এত নীল রং পৃথিবীতে ছড়ানো কেন ? নিজেই উত্তর দিয়াছেন, অনন্ত নীলাকাশ এত দূরে, এত উঁচুতে যে আমাদের মনকে নীলের দিকে উন্মুখ করিয়া দিবার জন্যই কেবল বোধহয় উহা আছে :

"Why make so much of fragmentary blue
In here and there a bird or butterfly
Or flower : or wearing stone : or open eye
When heaven presents in sheets the solid hue ?
Since earth is earth, perhaps not heaven (as yet)
Though some savants make earth include the sky ;
And blue so far above us comes so high
It only gives our wish for blue a whet."

কবিরাও সাধক, ধর্ম-পথের সাধকের ন্যায় তাঁহারাও শেষে বিরাট ভূমায় অনন্ত ভালবাসায় বিলীন হইয়া যাইতে চান। উপরে কথিত প্রবন্ধটি শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় এই স্বয়ম্প্রভ বাক্যগুলি দিয়া শেষ করিয়াছেন,—"যে দিকে তাকাই সে দিকেই যদি সৌন্দর্য না দেখিতে পাই, যাহাকে দেখি তাহাকেই যদি ভালবাসিতে না পারি তবে রসসাধনায় সিদ্ধি হয় নাই বুঝিতে হইবে। সৌন্দর্য অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হয় না। ভালবাসার কোন হেতু নাই। পূর্ণ সৌন্দর্য পূর্ণ প্রেমের সহিত স্বাভাবিক মিলনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের যাবতীয় বস্তুর সহিতই স্বাভাবিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কেহই পর থাকে না, কিছুই কুৎসিত থাকে না। মানুষের জীবনে সৌন্দর্য সাধনার ইহাই যথার্থ পরিণাম"। [১৫]

এই পরিণামের দিকে পৃথিবীর সকল বড় কবিই গা ভাসাইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাতেও ইহার বহু আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার মন প্রায়শই যেন ভূমা-উন্মুখ।

(১৫) সাহিত্য-চিন্তা পৃঃ ২৭

"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো।
রাখিস না আর মায়ায় ঘেরে স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দেরে
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই এমন রাত আর পাবো না লো।"

কিম্বা

"(ঐ) মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, "আয় চলে আয়
ওরে আয় চলে' আয় আমার পাশে" ॥
বলে আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা
হেথা বাতাস গীতি-গন্ধ-ভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে ॥"

কিম্বা

"চরণ ধরে' আছি পড়ে' একবার চেয়ে দেখিস না মা
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।
একি খেলা খেলিস ঘুরে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধ'রে ডাকে মা মা।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয় পায়ে ভব আত্মহারা
মুখে হা হা অট্টহাসি অঙ্গবেয়ে রক্তধারা
তারা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা অভয়ে অভয় দে মা
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় যদি তাঁহার নাটকগুলির কবিত্ব-সম্পদ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না করি। আমাদের দেশের অনেক সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের নানারকম খুঁত ধরিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, নাটকের আইন কানুন দিয়া বিচার করিলে ওগুলা নাকি নাটকই হয় নাই। ইহার উত্তরে আমার নিবেদন— দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছেন তাহা নাটক নয় তাহা তাঁহার কবি-চিত্তের অপরূপ সৃষ্টি। তাহা নাটক আকারে লিখিত হইয়াছে সন্দেহ

নাই, মঞ্চে মঞ্চে অভিনয়-গৌরবের জয়মাল্যেও তাহারা ভূষিত, কিন্তু আসলে ওগুলি প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাশালী কবি-মানসের অপরূপ সৃষ্টি। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বিখ্যাত জি· কে. চেষ্টারটন (G. K. Chesterton) লিখিতেছেন —"Dickens's work is not to be reckoned in novels at all. Dickens's work is to be reckoned always by characters, sometimes by groups, oftener by episodes, never by novels." ১৬ তেমনি আমরাও বলিতে পারি, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির সাহিত্যিক মূল্য তাহাদের নাটকত্বের জন্য ততটা নহে, যতটা তাহাদের কবিত্বের জন্য, বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীর জন্য এবং চরিত্র-চিত্রণের জন্য। তাঁহার রাণা প্রতাপ সিংহ, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, নূরজাহান, সীতা, পাষাণী নাটক হিসাবে যেমনই হোক কাব্য হিসাবে তাহারা যে অপূর্ব সৃষ্টি এ কথা রসিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। রাণা প্রতাপ সিং, গোবিন্দ সিং, চাণক্য, আওরঙ্গজেব, শক্তসিংহ, নূরজাহান, মানসী, মেহেরুন্নিসা, সীতা, গৌতম, অহল্যা, মাধুরী প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রই প্রতিভাবান চিত্রকরের আঁকা এক একটি অনুপম চিত্র। সব চিত্রগুলির মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মা স্পন্দিত হইতেছে। এ গুলির মধ্যে স্রষ্টা নানাভাবে নিজের স্বকীয় প্রতিভার বহুমুখিতাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

মার্কিন ঔপন্যাসিক নোবেল লরিয়েট উইলিয়ম ফক্‌নার (William Falkner) নোবেল প্রাইজ লইবার সময়ঃ তাঁহার বক্তৃতায় একটি প্রাণস্পর্শী সত্য কথা বলিয়াছেন—"The subject of the literary artist is the human heart in conflict with itself." ১৭

(১৬) Charles Dickens by G. K. Chesterton PP. 58

(১৭) World Literature (A Mentor Book) PP. 162.

কবি-হৃদয়ের নানা পরস্পর-বিরোধী সুরের ঐকতানই কবির কাব্য। দ্বিজেন্দ্রলালের বহু কবিতায় ইহার সমুজ্জ্বল প্রমাণ দেদীপ্যমান। তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলিতেও এই সত্যের মূর্ত প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ, টেনিসন, শেলী, কীটস, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় কবিরাও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। বিশেষ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের একটি চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তিবাদী মন, আদর্শবাদীর আক্ষেপ বা ক্ষোভ, এবং দূরদর্শী কবির আসন্ন বিপদ-আশঙ্কা মূর্ত হইয়াছে—সে চরিত্র চাণক্যের। দ্বিজেন্দ্রলালই যেন চাণক্য। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করিতে দ্বিধা করেন নাই। অপমানের প্রতিশোধ লইয়া অপমানিত শিখাগুচ্ছকে সোল্লাসে রক্তরঞ্জিত করিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাটের সিংহাসনে বসাইয়াছেন, ভাঙিয়া-পড়া মুরা ও কাত্যায়নকে ছলে-বলে কৌশলে বক্তৃতার জাদুতে মুগ্ধ করিয়া স্বপক্ষে আনিয়াছেন, অবশেষে মাতৃ-হারা দস্যু-অপহৃতা কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া দস্যুকে বলিয়াছেন :—"তোমায় এক রাজ্যখণ্ড দিব। দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছ। তুমি আমায় সম্রাট করেছ। তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ করে' আবার স্বর্গে উঠিয়েছ। আমি তোমাকে বধ করে' তোমার মূর্তি গড়িয়ে পূজা করব। না না একি! এ আনন্দ না দুঃখ? এ যে—এ যে, না একটা কিছু করতে হবে, যাতে বুঝতে পারি আমি বেঁচে আছি"—। নাটকের গোড়ার দিকে শ্মশান-প্রান্তে দাঁড়াইয়া যে চাণক্য বলিতেছেন—"ঐ বদ্ধ জলার উপর একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিঃশ্বাস আটকে আসছে। ঘেয়ো কুকুরের বিকট ঘেউ ঘেউ শব্দ পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। প্রভাতের সর্বাঙ্গে ঘা। পূঁষ পড়ছে। হে সুন্দরী বীভৎসতা। তুমি এত সুন্দরী। তাই আমি গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে নিত্য প্রত্যূষে তোমার

কদর্যতায় স্নান করতে যেয়ে আসি ; তুমি আমায় অনেক শিখিয়েছ প্রেয়সী আমার ! তুমি আমায় শিখিয়েছ সংসারকে ঘৃণা করতে, ক্ষমতাকে তুচ্ছ করতে, ঈশ্বরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোজা হ'য়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে। হে সুন্দরী ! আমায় সংসার হ'তে আরও দূরে টেনে নিয়ে যাও—যত দূর পারো। নরকে হয় তাও ভালো : শুধু সংসার থেকে যত দূরে হয়"।—সেই চাণক্যই কন্যা আত্রেয়ীকে ফিরিয়া পাইবার পর বলিতেছেন—"আর আমি শাসন কর্ত্তে চাই না। এখন আয় মা (আত্রেয়ীকে) তুই আমায় শাসন কর। তুই এই ভ্রান্ত পুত্রের হাত দুইখানি স্নেহবন্ধনে বেঁধে দে মা—যেমন যশোদা ননী চোরার হাত দুইখানি বেঁধে দিয়েছিল।"

দ্বিজেন্দ্র-জীবনী পাঠ করিয়া যে ব্যক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি—যাঁহার বিড়ম্বিত জীবনের বহু আর্তনাদ, অত্যাচার-অপমানের বিরুদ্ধে যাঁহার বহু সংক্ষোভ, বিরূপ ভাগ্যের বিরুদ্ধে বহু ব্যাকুল প্রতিবাদ যাঁহাকে বিদ্রোহ-উত্তেজনায় বারংবার উত্তেজিত করিয়াছে, অথচ আবার যিনি ভাব-প্রবণ, স্নেহের কাঙাল, বাৎসল্য রসে অতি কোমল সেই দ্বিজেন্দ্রলালকেই যেন চাণক্য চরিত্রে মূর্ত দেখিতে পাই। শক্তসিংহ চরিত্রেও যেন তাঁহার যুক্তিবাদী অথচ ভাবপ্রবণ মনের আভাস আছে। বস্তুত সমস্ত কবিরাই নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঢালিয়া দেন। কল্পনার আলোকে, রূপের বৈচিত্র্যে, তাহা নানা মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া নানারূপে রসিক চিত্তকে উদ্ভাসিত করে। T. S. Eliot এর—'The three voices of poetry' নামক যে বিখ্যাত নিবন্ধটি আছে তাহার প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন "The first voice is the voice of the poet talking to himself —or to nobody. The second voice is the voice of the poet addressing an audience, whether large or small. The third is the voice of the

poet when he attempts to create a dramatic character speaking in verse; when he is saying, not what he would say in his own person, but only what he can say within the limits of one imaginary character addressing another imaginary character"[১৮] : এই তিনটি voice-ই দ্বিজেন্দ্র-কাব্যে শোনা যায়। এই ত্রি-ধারাই সব কবির কাব্যকে ত্রিবেণী-তীর্থ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য হইতে ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধ বড় হইয়া গিয়াছে, এ প্রবন্ধে আর সে সবের স্থান নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বিবিধ কাব্য-রত্নের বিস্ময়কর মঞ্জুষা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িল। অনেকে বলেন দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি শেক্‌সপীয়রের নাটক হইতে, সংস্কৃত নাটক হইতে অনেক ভাব আহরণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্পর্কেও এরূপ একটা গুজব প্রচলিত আছে। শেক্‌সপীয়র স্বয়ংই এ-দোষ হইতে মুক্ত নন। তাঁহার অনেক নাটকের গল্প তাঁহার নিজের নহে। হ্যামলেট-এর যে রূপ আমরা দেখি তাহা তাহার তৃতীয় রূপ। ইহার পূর্বে অন্য নাট্যকারেরা নাকি ওই একই গল্পকে আরও দুইটা রূপ দিয়াছিলেন। সব বড় সাহিত্যিকের উপরই অন্য বড় সাহিত্যের ছাপ অনিবার্যরূপে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, শেলী, ব্রাউনিং, বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল সঙ্গীত, উপনিষদ, কালিদাস—কত কিছুরই তো প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি রবীন্দ্রনাথ স্বমহিমায় রবীন্দ্রনাথ। পরস্বাপহরণ করিয়া যেমন আমাদের দেহ গঠিত তেমনি প্রতিভাবান লেখক-লেখিকাদের চিন্তা-রশ্মিতে আমাদের প্রতিভাও প্রভাবিত। অন্য লেখকের প্রভাব হজম করিয়া তাহা স্বকীয় প্রতিভার অঙ্গীভূত

(১৮) On Poetry and Poets by T. S. Eliot 89.

করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই বড় লেখক। এই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়র বা মুদ্রারাক্ষস হইতে চুরি করেন নাই, তাহাদের হজম করিয়া স্বকীয় প্রতিভাবলে নূতন সৃষ্টি করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলাল সামান্য একটা বক্তব্যকে, সামান্য একটা জিনিসকে, ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া অকারণে বৃহৎ করিতেন। ইহাতে নাকি art ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। "এই যদি ঘটে থাকে তাহলে সৃষ্টি ধ্বংস হ'য়ে যাক"—যেখানে এইটুকু বলিলেই চলিত সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"তবে আর কেন? ঈশ্বর আর তাকে রেখো না, এইক্ষণেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেল। যদি তাই হয়, তবে এখনও আকাশ তুমি নীলবর্ণ কেন। সূর্য! তুমি এখনও আকাশের উপরে কেন? নির্লজ্জ, নেমে এস। একটা মহাসংঘাতে তুমি চূর্ণ হয়ে যাও। ভূমিকম্প তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙ্গে খান খান করে' ফেল। একটা দাবানল জ্বলে' উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে' দিয়ে চলে' যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণী-ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও"।[১৯] এই বাড়াবাড়ি অনেকের ভালো লাগে নাই। কিন্তু G. K. Chesterton-এর মতো নামজাদা শিল্পী ডিকেন্সের কাব্য-জীবন আলোচনা করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন —Exaggeration is the definition of art."[২০] Dickens সম্বন্ধে যেমন, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও তেমনি এ কথা সত্য। পাপিয়া ধাপে ধাপে সুর চড়াইয়া যেমন সুরসপ্তকের শেষ-বিন্দুতে গিয়া 'চোখ গেল' বলে, দ্বিজেন্দ্রলালও তাহাই করেন। তাঁহার বক্তব্য আবেগ-সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মহিমাময় কাব্যে রূপান্তরিত হয়। ধাপে ধাপে

(১৯) সাজাহান দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

(২০) Charles Dickens by G. K. C. PP. 18.

ওঁহার এই প্রবণতা তাঁহার বাল্যরচনাতেও আছে। আর্যগাথা প্রথম ভাগের একটা ছোট কবিতার আরম্ভ এইরূপ। কবিতাটির নাম দিনমণি,—

“জ্বলন্ত গৌরব ! মহান্ সুন্দর
জীবন্ত বিস্ময় ! দেব প্রভাকর
মৃত্তিকায় বদ্ধ বিস্মিত মানব
পূজে জানুপাতি ক্ষুদ্র নেত্র তুলি।”

দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি বা নাট্যকার ছিলেন না, একজন বড় সুরকারও ছিলেন। বিদেশী সুরকে তিনি স্বদেশী করিয়াছিলেন। আর্যগাথা গীতিগুচ্ছ। অনেক প্রসিদ্ধ গানেও তাহার প্রমাণ আছে। আমার মনে হয় গদ্যকে গানের মতো ধাপে ধাপে চড়াইয়া তিনি একটা Climax-এ লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিভা বলে। রবীন্দ্রনাথও আমাদের দেশের আর একজন বড় সুরকার। তাঁহার গদ্যও সুরময়। কিন্তু সে সুর দ্বিজেন্দ্রলালের সুর হইতে স্বতন্ত্র। আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত প্রবাস-কালে ইংরেজী ভাষায় Lyrics of Ind রচনা করিয়া সে দেশের রসিক সমাজে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার Lyrics of Ind-এ যে ভাবরাশি প্রস্ফুটিত তাহাও অনেক স্থলে অনন্য। সামান্য একটা উদাহরণ দিই—

“Do not anatomise her beauty
Her true beauty to discover
You must hear her inner music
You must, friend, first learn to love her.”

কালিদাস ও ভবভূতি প্রবন্ধেও তাঁহার কাব্য-প্রতিভার আর একটা রূপ দেখা গিয়াছে। রস-বিশ্লেষণেও তাহার প্রতিভা নির্ভীক। ভবভূতির নাটকের শেষ সম্বন্ধে বলিতেছেন—“ভবভূতি

এক অঙ্কেই করিলেন অভিনয়ে বিয়োগ ও বাস্তবে মিলন। কিন্তু হইয়া দাঁড়াইল বাস্তবে বিয়োগ ও অভিনয়ে মিলন।······এ নাটক এইরূপে শেষ করিয়া ভবভূতি শুদ্ধ কাব্যকলাকে হত্যা করেন নাই, Poetic Justiceকেও হত্যা করিয়াছেন। একজন অত্যাচারীকে অন্তিমে সুখী দেখিলে পাঠক কি শ্রোতা কেহই সন্তুষ্ট হয় না। ভবভূতি এ নাটক সেইরূপ করিয়াছেন।"—এই নির্ভীকতা শুধু তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নহে, তাঁহার প্রতিভারও বৈশিষ্ট্য।

প্রত্যেক কবিই স্রষ্টা এবং প্রত্যেক কবিই তাঁহার নিজের জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সে জগৎ সুন্দর, সে জগৎ অনন্য, এবং সে জগৎ রহস্যময়ও। একটি প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-জগতের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যায় না। সে জগতের সমস্ত উপাদানের পরিচয় দেওয়াও দুঃসাধ্য। কারণ কবির দৃষ্টি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন হইতে কখন কিভাবে যে কত সৌন্দর্য আহরণ করিয়া নিজের সৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন সংক্ষেপে তাহার পরিমাপ করা শক্ত। শেক্সপীয়রের ভাষায় "The poet's eye in a fine frenzy rolling doth glance from heaven to earth, from earth to heaven and as imagination bodies forth the forms or things unknown, the poets' pen turns them to shapes and gives to airy nothing a local habitation and a name."

কবি ঐন্দ্রজালিক যাদুকর। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দলের।

নবরসে নববর্ণে করিতেছে আত্ম-আবিষ্কার
খেয়ালী মানব-স্রষ্টা
ক্ষণিকের খেলা-ঘরে বসি';
ক্ষণিকের খেলা তবু হতেছে শাশ্বত।
মানবের সৃষ্টির প্রকাশ
লোক হতে লোকান্তরে

যুগ হ'তে যুগান্তরে
চলিয়াছে মন্ত্রে যন্ত্রে আনন্দে ব্যথায়,
রক্তাক্ত সমারঙ্গনে
পুষ্পাকীর্ণ বাসক শয্যায়
চলিয়াছে তালে ও বেতালে
তারে ও বেতারে
আলোকে আঁধারে
সে বাণীর যাত্রাপথ অনন্ত অসীম।
মহাকাল-পটভূমিকায়
পদচিহ্নগুলি মাঝে মাঝে জেগে আছে শুধু।
আকাশেতে রাজহংস আজও উড়িতেছে
তার পাশে উড়িতেছে প্লেন
সেদিনের শতদল হ'য়েছে সহস্রদল আজি
মৃণ্ময় দীপের পাশে জ্বলিতেছে বিদ্যুৎবর্তিকা
জ্বলিতেছে মানুষের মন।

প্রদীপ্ত জ্বলন্ত মনের মহিমাময় অধিকারী কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রণাম জানাইয়া আমার ভাষণ শেষ করিলাম।

স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল

একটা কথা প্রচলিত আছে স্বদেশপ্রেম আমরা নাকি ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। কথাটা সত্য নহে। যে আদিম ভারতবাসীদের পরাজিত করিয়া যাযাবর আর্যগণ এদেশে আসিয়া বসবাস করিতে শুরু করেন তাঁহাদের মধ্যেও স্বদেশ-প্রেম স্বজাতি-প্রেম ছিল। ইহার অনেক প্রমাণ আছে। কারণ স্বদেশ-প্রেম স্বজাতি-প্রেম অন্যান্য নানাবৃত্তির মতো মনুষ্যের মজ্জাগত। আর্যদের সহিত অনার্যদের বহুদিনব্যাপী বহু যুদ্ধই ইহার প্রমাণ। আর্যগণ যখন এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইলেন, যখন তাঁহারা এদেশে আসিয়া বেদ উপনিষদ রচনা করিয়া একটা নূতন সভ্যতার পত্তন করিলেন, ভারতবর্ষকে তাঁহারা যখন দেবভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়া সে দেশে শত শরৎ বাঁচিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, সে দেশের নদ-নদী গিরি-পর্বত অরণ্য-কান্তারকে দেব-দেবীর নামে চিহ্নিত করিয়া পূজা করিলেন, তীর্থে তীর্থে যখন দেবদেবী ঋষি মুনিদের মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহারা আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করিলেন—তখন তাঁহারা যে এদেশকে ভালবাসেন নাই একথা অবিশ্বাস্য। ইংরেজদের নিকট আমরা শিখিয়াছি 'ন্যাশনালিজ্‌ম্‌' (Nationalism)—তাহা ওই স্বদেশ-প্রেমেরই বিকৃত খর্ব সংস্করণ। স্বদেশ-প্রেম মানব-প্রেমকে বহিষ্কার করে না, কিন্তু 'ন্যাশনালিজ্‌ম্‌' করে। তাহাতে উদারতা নাই, বিশ্ববাসীর প্রতি সমদৃষ্টি নাই, কিন্তু স্বদেশ-প্রেমে আছে। ন্যাশ-নালিজ্‌মে বিনয় নাই, হামবড়া ভাবটাই প্রবল। নিজের কুৎসিত জিনিসকেও সুন্দর বলিয়া ঢাক পিটাইয়া জাহির করিবার প্রবণতাটা তাহার বড় বেশী। এই ন্যাশনালিজম্‌ই খর্ব হইতে খর্বতর হইয়া

প্রভিনসিয়ালিজম্, (Provincialism) এবং কাষ্টিজমে (Caste-ism) পরিণত হইয়া অবশেষে নিজেদের মধ্যে কুৎসিত দলাদলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই দলাদলিতেই আমরা এখন নিমজ্জিত। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেম এই দলাদলি-মার্কা গ্যাশনালিজম্ ছিল না। তাহা প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রেমের উপর, বিদ্বেষের উপর নয়। তাঁহার জীবনীকার দেবকুমার বাবু লিখিতেছেন—"তৎকালে মাতৃপ্রেমে মাতোয়ারা দ্বিজেন্দ্রলাল আপন আন্তরিক অসীম আগ্রহেই বাঙ্গালীর এই দেশব্যাপী "স্বদেশী"-আন্দোলনের অতিবড় উৎসাহী অনুবর্তক, সমর্থক ও প্রচারক হইয়াছিলেন—যদিও যে রাজনৈতিক কারণে এ দেশে এই আন্দোলনের আবির্ভাব, তাহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। দেশাত্মবোধই তাঁহার মনুষ্যত্বকে তাঁহার প্রতিভাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। টাউন-হলে অনুষ্ঠিত সভায় যে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে তিনি ক্ষুব্ধ ও আক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।" [১] এই সময় দেবকুমার বাবুকে একটি পত্রে লিখিতেছেন,—

"আজ নব-জীবনের উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা তন্ময় হইয়া গিয়াছি। বাঙ্গালীর জীবনে আজ এ কি অপূর্ব আস্বাদ। যাহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনারও অতীত ছিল, আজ সেই বিচিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন আমার ধন্য সার্থক হইল। এত সুখও যে আমাদের অদৃষ্টে ছিল তাহা কে জানিত ভাই। ধন্য সুরেন্দ্রনাথ! সার্থক তোমার জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনা। কিন্তু এত আনন্দের ভিতরেও একটা কথা যখন আমার মনে হয় তখন আমি আশঙ্কায় উদ্বেগে কিছু ভীত ও চঞ্চল হই। মাকে আমার ভালবাসিব, সেবা করিব, অভিনব সুন্দর সাজ-সজ্জায় নিয়ত অলঙ্কৃত করিব, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-প্রেম-কুসুমে সতত পূজা করিয়া চিত্ত-প্রসাদে ডুবিয়া থাকিব—আমার এই যে সাধ, এই যে আশা, এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক

(১) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৩১০-১১

প্রবৃত্তি। সুসন্তানের স্বভাবতঃ এ ইচ্ছা হইয়া থাকে, আর যার হয় না সে হতভাগ্য, কুলাঙ্গার, নরাধম। কিন্তু এই যে সব সাধ আকাঙ্ক্ষা এর জন্য আমি বাহিরের সুযোগ বা অবকাশের সন্ধান করি কেন? আর ও সব ভাবোদ্রেকের জন্য আমরা এখন বাহিরের দশটা কারণ ও অবস্থার উপরেই বা নির্ভর করিতে চাই কেন?··· যদি আন্তরিক অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসায় মার দৈন্য-ক্লেশ দূর করিতে না পারি তবেই ত ভয় হয়—বুঝি বা আমাদের এই পূজা আন্তরিক নহে; তবেই তো ভয় হয়—হয়তো বা আমাদের এ অবস্থা ও ইচ্ছা স্থায়ী নয়, স্বাভাবিক নয়···"[২]

স্বল্পকাল স্থায়ী হুজুকের, সোডা-ওয়াটারের মতো বুদ্বুদময় স্বাদেশিকতার উপর তাঁহার আস্থা ছিল না। গভীর অনাড়ম্বর, আন্তরিক অকৃত্রিম মাতৃভক্তির মতো তাঁহার স্বদেশ-প্রেম স্বতোৎসারিত সুবিমল নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার আদর্শের চতুর্দিকে নানা রূপে নানা ভঙ্গিমায়, অফুরন্ত রূপলাবণ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়াছে। এ প্রেম তাঁহার বিশ্বপ্রেমের অঙ্গ, সঙ্কীর্ণ ন্যাশনালিজম্ নহে। তাঁহার বিখ্যাত নাটক 'মেবার পতনে' তিনি স্বদেশ-প্রেমের যে ছবি আঁকিয়াছেন, স্বদেশের দুঃখ-দৈন্য-দোষ-শৌর্য বীর্য সমস্ত মিলাইয়া হতাশা-বিষাদ-আনন্দের যে-এক অনুপম কাব্য সৃজন করিয়াছেন, তাহারই মধ্যে 'মানসী' একটি অনবদ্য আশ্চর্য সৃষ্টি। গোবিন্দ সিংহের কন্যা কল্যাণী তাহার মুসলমান স্বামী মহাবৎ খাঁ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে—'তাঁকে ভালবাসায় আমার পাপ নেই?' মানসী উত্তর দিতেছে—'ভালবাসায় পাপ! যে যত কুৎসিত তাকে ভালবাসায় তত পুণ্য! যে যত ঘৃণিত, সে তত অনুকম্পার পাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই এক অনাদি সৌন্দর্যের কিরণ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। এমন হৃদয় নাই যেখানে সেই জ্যোতির একটিও রেখা এসে পড়েনি। তার উপর মহাবৎ খাঁ অধার্মিক নন, তিনি মুসলমান মাত্র। তিনি যদি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম না বলে' আল্লা বলেন তাতে

(২) দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৩৯১-৩৯২

কি তিনি এই ভাষার ভোজবাজিতে পাপী হয়ে গেলেন ?···প্রেমের রাজ্যে সুন্দর-কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই, প্রেমের রাজ্য পার্থিব নয়। তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে। প্রেম-বন্ধন ব্যবধান মানে না। সে একটা স্বচ্ছ স্বতঃউচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য। মৃত্যুর উপর বিজয়ী আত্মার মতো, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের উপর মহাকালের মত, সে সঙ্গীত অমর···'

এই সঙ্গীতেই স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় পূর্ণ ছিল। 'মেবার পতন' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে সত্যবতীকে মানসী বলিতেছেঃ

"মানসী।···আমাদের সেই সাধনা হোক। উচ্চ সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না। এ জাতি আবার মানুষ হবে।

সত্যবতী। সে কবে ?

মানসী। যে দিন তারা এই অথর্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখবে ; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বইবে ; যে দিন তারা যা উচিত বা কর্তব্য বিবেচনা কর্বে নির্ভয়ে তাই করে যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। যেদিন তারা যুগ-জীর্ণ পুঁথিকে ফেলে দিয়ে—নব ধর্মকে বরণ কর্বে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম মানসী ?

মানসী। সে ধর্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাসতে শিখতে হবে। তারপর আর তাদের কিছু কর্তে হবে না, ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নহিলে নিজে কুটিল স্বার্থসেবী হয়ে রাণা প্রতাপ সিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবে নির্বাণ প্রদীপ কোলে করে চির জীবন হাহাকার করলেও কিছু হবে না"—

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেমে অশোভন আত্ম-আস্ফালন নাই, আত্মসমালোচনা আছে। আছে আমাদের অধঃপতনে ক্ষোভ, আর আপশোষ। শম্ভুজীর সহায়তা লাভে বঞ্চিত দুর্গাদাসের ক্ষুব্ধ উক্তি স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালেরই অন্তরমথিত হতাশা—

'যোদ্ধা বটে মারাঠা জাত। অদ্ভুত অশ্বচালনা, অদ্ভুত সমর কৌশল, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা। এর সঙ্গে যদি রাজপুত জাতির একাগ্রতা, ত্যাগ আর দৃঢ়তা পেতাম, কি না হতে পার্ত। না, তা হবার নয়। ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়! হিন্দু জাতি যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে আর এক হবার নয়। সে তেজ গিয়েছে যাতে কম্পমান আত্মাকে পরের হিতে টেনে নিয়ে যায়। উঠেছিল এই আর্যজাতি—যেদিন ব্রাহ্মণের তপোবল ছিল, ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ ছিল, বৈশ্যের নিষ্ঠা ছিল, শূদ্রের কর্তব্যবোধ ছিল। সে সব গিয়েছে; আর ফির্বার নয়। এখন আবার নূতন উপাদানে জাতীয় চরিত্র গঠন কর্তে হবে, নূতন বলে উঠতে হবে, নূতন তেজে কম্পমান হতে হবে...'

দুর্গাদাসের এ আশা সফল হয় নাই। শেষ অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে দুর্গাদাস বলিতেছেন—'ব্যর্থ হয়েছি। পার্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে। সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি নির্জীব হয়েছে। নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়িয়ে দেখেছি যে পুরবাসীরা নিস্তেজ। ছায়ানিবিড় গ্রামগুলি দিয়ে হেঁটে গিয়েছি, দেখেছি গ্রামবাসীরা নিশ্চেষ্ট উদাসীন। বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গিয়েছি, দেখেছি কৃষকেরা অলস মন্থর গমনে ভূমিকর্ষণ করছে। সমস্ত জাতির প্রাণ নেই। অত্যাচারে প্রপীড়িত হলেও পদাহত স্থবির কুকুরের মতো নিম্নস্বরে একটা গভীর আর্তনাদ করে মাত্র। প্রতিকারের চেষ্টা করে না। মোগল সাম্রাজ্য থাকবে না বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠবে না।' দ্বিজেন্দ্রলালের এই আক্ষেপ, এই হতাশা, এই বিলাপ তাঁহার বহু গানে, নাটকের নানা চরিত্রের মুখে কখনও গম্ভীর ভাবে কখন ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সুরে মূর্ত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে অন্ধ করে

নাই। তিনি বিস্ফারিত সজল নেত্রে দেশের গলদগুলি দেখিয়াছেন এবং তাহার প্রতিকারের উপায়ও ভাবিয়াছেন।

কবি Goldsmith একটি কবিতার দুই লাইনে যে জাতীয় Patriot-এর কথা বলিয়াছেন—

'The Patriot's boast wherever we roam
His first, best country is ever is at home.'

দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু সেই জাতের Patriot ছিলেন না। তিনি দেশের বিবিধ দোষ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ছিলেন, কিন্তু বিদেশে যেখানেই তিনি মানবতার উৎকর্ষ দেখিয়াছেন সেখানেই তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন।

জনসনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি—'Patriotism is the last refuge of the Scoundrels'—জনসনের দেশের লোকের সম্বন্ধেই বেশী খাটে, যে দেশে Patriotism ও politics প্রায় গলাগলি করিয়া চলে;—এ দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধেও খাটে যাঁহারা এদেশে বিলাতী ধাঁচে পলিটিক্সের রঙ্গমঞ্চে স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা মুখোশ পরিয়া অবতীর্ণ হন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে খাটে না। কারণ তিনি পেশাদার Patriot ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বদেশ-প্রেমিক কবি, তিনি আদর্শ মনুষ্যত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সে আদর্শ দেশে নাই বলিয়া তিনি বারম্বার আক্ষেপে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, দেশের চারিত্রিক অবরোহণে, অনিবার্য পরাজয়ে, বিগত-মহিমার স্মৃতিতে ব্যাকুল হইয়া তিনি বারবার কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়াছেন। 'মেবার পতন' নাটকে মেবারের পরাজয়ের পর সত্যবতীর কণ্ঠে যে মর্মন্তুদ গান উৎসারিত হইয়াছে তাহা দ্বিজেন্দ্রলালেরই বিক্ষত মর্মের অশ্রুসিক্ত আকুল ক্রন্দন—

"ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার

এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে
আজি মা কি গান গাহিব আর।
মেবার পাহাড় হইতে তাহার
নেমে গেছে এক গরিমা হায়
ঘন মেঘরাশ ঘেরিয়া আকাশ
হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার
পিকবর আজ হরষ গান
ফোটে নাক ফুল আসে না আকুল
ভ্রমর করিতে সে মধুপান।
আর নাহি বয় শিহরি মলয়
আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ
মেবার নদীর ম্লান ছুটি তীর
করে নাক আর সে কলনাদ।
মেবার পাহাড় শিখরে তাহার
রক্ত-নিশান উড়ে না আর
এ হীন সজ্জা এ ঘোর লজ্জা
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার।"

মেবার একটা রূপক মাত্র, সমস্ত দেশকে লক্ষ্য করিয়াই এ গান তিনি গাহিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার স্বদেশী তিনটি নাটকই—রাণা প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস এবং মেবার পতন—টড-এর রাজস্থান অবলম্বনে মুসলমানী শাসনের কাহিনী, কিন্তু তাঁহার আসল লক্ষ্য ছিল তাঁহার সমসাময়িক অধঃপতিত ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষ ইংরেজের বুটের তলায় নিষ্পিষ্ট, যে ভারতবর্ষের শঠতা, অসাধুতা, নীচতা, কাপুরুষতা ও চাটুকার বৃত্তি তাহার ভবিষ্যৎকে বারম্বার ম্লান করিয়া দিতেছে—সেই ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যেই স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের কবি হৃদয় নানা সুরে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। কখনও তিনি আমাদের অতীত গৌরব

স্মরণ করিয়া মৃত্যু-শয্যায় শায়িত প্রতাপের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—'ঐ সেই চিতোর। ঐ সেই দুর্জয় দুর্গ, যা একদিন রাজপুতের ছিল, আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়ছে—মনে পড়ে আজ আমার পূর্ব-পুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে' গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন। মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমর সিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ যাতে কাগার-নদের নীল বারিরাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুতের শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীর নারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শবর্ষীয় পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখছি। ঐ সেই চিতোর। তা উদ্ধার করব ভেবেছিলাম কিন্তু পাল্লাম না'……এই একই কথা উদয়পুরের রাজপথে সত্যবতী চারণের দল লইয়া গাহিয়া বেড়াইতেছেন—কবির বীণা গানের ছন্দে বাজিয়াছে—

"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়
যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর
বিরাট দৈন্য দুঃখে তাহার
শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বলিল সেখানে যেই দাবাগ্নি
সে রূপ-বহ্নি পদ্মিনীর
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে
যবন সৈন্য ক্ষত্র-বীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার
রক্ত পতাকা উচ্চ শির
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।"

সেই একই কবির হৃদয় আবার ঔরঙ্গজীবের লক্ষাধিক শত্রু সৈন্য

দেখিয়া শৌর্য-বীর্যে-প্রেরণায় জ্বলন্ত মশালের মতো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দুর্গাদাস নাটকে মাড়বারের রাণীর মুখ দিয়া তিনিই যেন গ্রামবাসীদের বলিতেছেন—'তোমাদের গ্রাম, কুটির ছেড়ে চলে' এস। তরবারি লও। ওঠ; এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। একবার দৃঢ় পণ করে' ওঠো! ওঠো যেমন তূরীশব্দে সুপ্ত সিংহ জেগে ওঠে। ওঠো যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে' ওঠে; ওঠো যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে; যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গে কল্লোল ওঠে; ওঠো, রাজস্থান জানুক, ঔরঙ্গজীব জানুক যে তোমাদের শৌর্য সুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয় নাই।' সেই একই কবি সমরক্ষেত্রে যাইবার জন্য দেশবাসীকে উৎসাহ দিতেছেন—

"ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা—
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ওই ডাকে ভারত মাতা।
কে বল করিবে প্রাণের মায়া
যখন বিপন্না জননী জায়া
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে"

কখনও আবার কল্পনা করিতেছেন প্রকৃত দেশ-প্রেমিকের ডাকে দেশ সত্যই বুঝি জাগিয়া উঠিবে। তাই শক্তসিংহ যখন তাহার দাদা প্রতাপ সিংহের নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছেন তাহা তাঁহারই স্বদেশ-প্রেমিক হৃদয়ের সুখ-কল্পনা।

"প্রতাপ। তুমি! সৈন্য কোথায় পেলে?

শক্ত। সৈন্য! পথে সংগ্রহ করেছি। যেখান দিয়ে এসেছি চীৎকার করে' বলতে বলতে এসেছি যে, 'আমি প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহ: যাচ্ছি প্রতাপ সিংহের সাহায্যে, কে আসবে এস। —তা শুনে বাড়ির গৃহস্থ স্ত্রী ছেড়ে এল, পিতা ছেলে ছেড়ে এল, কৃপণ টাকা ছেড়ে এল। রাস্তার মুটে মোট

ফেলে অস্ত্র ধর্লে, কুব্জ সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। দাদা, তোমার নামে কি জাদু আছে তুমি জাননা, আমি জানি।"

আবার কখনও কল্পনা করিতেছেন যে ঔরঙ্গজীবের স্তাবক পৃথ্বীরাজও প্রতাপ সিংহ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন এ সংবাদে বড়ই দমিয়া গিয়াছেন :

"পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ তুমি না কি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছ?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী। হায়, হতভাগ্য হিন্দুস্থান! শেষে প্রতাপ সিংহও তোমাকে পরিত্যাগ কর্লে। প্রতাপ! আমরা উচ্ছন্ন গিয়েছি; আমরা দাস হয়েছি। তবু এক সুখ ছিল যে প্রতাপের গৌরব কর্তে পার্তাম।……

প্রতাপ। পৃথ্বা, লজ্জা করে না যে তুমি, তোমার ভাই, বিকানীর, গোয়ালিয়র, মাড়বার সবাই জঘন্য বিলাসে সম্রাটের স্তুতিগান কর্বে, আর আশা কর যে, এই সমস্ত রাজপুতনায় একা আমি, সামান্য দুবেলা দুমুঠো আহার—তার সুখও বিসর্জন করে' তোমাদের গৌরব কর্বার আদর্শ জোগাব?

পৃথ্বা। হাঁ প্রতাপ! অধম ভালুককে জাদুকর নাচায় কিন্তু কেশরী গহনে নির্জনে গরিমায় বাস করে। দীপ অনেক কিন্তু সূর্য এক। শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে, চরণে দলিত করে কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্বত গর্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে' থাকে। প্রতাপ! সংসারী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে রুক্ষ কেশে অনশনে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে তাকে নূতন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্মুক্ত তরবারি তাঁদের সত্যের জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে, অগ্নির লেলিহান শিখা তাদের কীর্তি প্রথিত করে। তুমি সেই সন্ন্যাসী প্রতাপ!"

কত রকম কল্পনাই না তিনি করিয়াছেন। অত্যাচারী মুসলমানের

বিরুদ্ধে উত্তুঙ্গ-শির অনমনীয় চরিত্র ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাসী বীর প্রতাপ সিংহের ভাস্বর চরিত্র তাঁহার অমর সৃষ্টি। নিজেই তিনি প্রতাপ সিংহ। তাঁহার নিজের তেজ, দীপ্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা এ অবস্থায় পড়িলে নিজে তিনি কি করিতেন, কি বলিতেন তাহাই যেন অনুপম শিল্প সুষমায় প্রতাপ চরিত্র হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাঁহার আর একটি অপূর্ব মহিমাময় সৃষ্টি পৃথ্বীরাজের স্ত্রী যোশী। পৃথ্বীরাজ কবি, আকবরের চাটুকার। তাঁহার স্ত্রী ঠিক তাহার বিপরীত। সামান্য একটু উদ্ধৃত করি—

"পৃথ্বী।···সম্রাট আকবর লোকটা বড় যা তা বুঝি। আসমুদ্রক্ষিতি-
শানাং—জানো? সমস্ত আর্যাবর্ত যাঁর পদতলে—

যোশী। ধিক, একথা বলতে বাধলো না? একথা বলতে লজ্জায় ঘৃণায় রসনা কুঞ্চিত হল না? এত দূর অধঃপতিত? ওঃ, না প্রভু সমস্ত আর্যাবর্ত এখনও আকবরের পদতলে নয়। এখনও আর্যাবর্তে প্রতাপ সিংহ আছে। এখনও একজন আছে যে দাস্যজনিত বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সম্রাটদত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে—"

দেশ তাঁহার অন্তরতম স্বপ্ন ছিল। জীবন-সাধনার আরাধ্য দেবতা ছিল। প্লেটোর উক্তি—'there can be no affinity nearer than our own country'—একথা দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে অত্যুক্তি নহে। দেশকে তিনি সত্যই অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দেশের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তি ছিলই; কিন্তু দেশের বর্তমান অধঃপতন দেখিয়াও তিনি বারবার বিচলিত হইয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে পড়িয়াছে—

"কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ—'

যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে ঘিরে আছে আজি আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।"

এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার কবি-কল্পনা বারবার দেশ-বন্দনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—

"ভারত আমার, ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থ-ক্ষেত্র

... ...

ভারত আমার ভারত আমার, সকল মহিমা হোক খর্ব
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব!"

ভারতবর্ষের রূপবন্দনায় তিনি মুখর হইয়া ভাবে যেন বিভোর হইয়া গিয়াছেন—

"শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট সাগর-উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।"

দেশবাসীকে যেন মিনতি করিয়া বলিতেছেন—

"একবার গালভরা মা ডাকে
মা বলে ডাক মা বলে ডাক
মা বলে' ডাক মাকে
ডাক এমনি করে' আকাশ ভুবন সেই ডাকে যাক ভরে
আর ভায়ে ভায়ে এক হ'য়ে থাক যেখানে যে থাকে
দুটি বাহু তুলে নৃত্য করে' ডাক রে মা মা বলে'
আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে—"

কখনও সাধের বীণা'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"পারো যদি জাগো বীণা—ধর আরও উচ্চতান
গাইব আমি নূতন গানে নূতন প্রাণে কম্পমান

(বীণা) পারো যদি জাগো তবে বেজে ওঠ উচ্চরবে
(আজ) নূতন সুরে গাইতে হবে আমি সঙ্গে ধরি তান
(ছেড়ে) লোক-লজ্জা সমাজ ভয় যাতে সবাই আবার মানুষ হয়
এমনি গাইতে পারি দয়াময় কর এই বরদান।"

এই একই কবিতায় আগের কলিতে তিনি গাহিয়াছেন—

"(কোথায়) আনন্দেতে উঠব নেচে মরা মানুষ উঠবে বেঁচে
(আমি) পাইনা শুধু সাগর সেঁচে ভাগ্যে শুধুই বিষ-পান।"

এই বিষ স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালকে বহুবার বহুভাবে পান করিতে হইয়াছে। তাই এই একই কবি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন বহুবার। মনে হয় নিজেকেই যেন তিনি ব্যঙ্গ করিতেছেন, নিজেরই শিরে করাঘাত করিয়া যেন বলিতেছেন—হায় ভগবান, আমরা এই! মন্দ্র-কাব্যে মুদ্রিত জাতীয় সঙ্গীতটি শুনুন—

"বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে
চৌদ্দশত পুরুষ আছি পরের জুতা খেয়ে
তথাপি ধাই মানের লাগি ধরণী মাঝে ভিক্ষা মাগি
নিজ মহিমা দেশ-বিদেশে বেড়াই গেয়ে গেয়ে
বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে।
লজ্জা নাই 'আর্য বলি' চেঁচাই হাসি মুখে
মুখে বলি তা বাজে যে কথা বজ্রসম বুকে।
... ...
কেহই এত মূর্খ নয় সবাই বোঝে, জেনো
হাজারি 'গীতা' পড় তুমি পয়সা বেশ চেনো
... ...
ব্যবসা কর, চাকরি কর নাহিকো বাধা কোন
ঘরের কোণে ক্ষুদ্র মনে রৌপ্যগুলি গোণ
চারটি করে' খাও ও পর, স্ত্রীর দু'খানা গহনা কর

আর্যকুল বৃদ্ধি কর ও পার কর মেয়ে
—বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে।"

দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালই ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালে রূপান্তরিত হইয়াছেন। একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

অনেককে বলিতে শুনিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী সঙ্গীত-গুলিতে গভীরতর অনুভূতি তেমন নাই। দেশের ভৌগোলিক বর্ণনা ও ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপেই তাহা মুখর। এই সব সমালোচকেরা ভুলিয়া যান যে মায়ের রূপ বর্ণনা এবং গুণ কীর্তন প্রকৃত সন্তানদের বক্ষে যে অনুভূতির সঞ্চার করে, যে আবেগে, যে মাধুর্যে তাহা অন্তরকে প্লাবিত করিয়া দেয় তাহা অবর্ণনীয়। 'মা, তোমার মুখখানি কেমন সুন্দর', 'মা তোমার হাতের রান্না কি অপরূপ,' 'মা তোমার চুলের মতো চুল আর তো কারো দেখি নি'—এই সব অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজ উক্তিগুলি গভীর প্রেম-সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ। যাহার মা রূপসী, যাহার মা মহীয়সী, যাহার মা জগদ্‌বরেণ্যা—সে তো মায়ের এসব কথা শত মুখে বলিবেই। মাতৃবন্দনায় সেটা না বলিলেই অশোভন অস্বাভাবিক হইবে। আমাদের দেশে দেব-দেবীদের বন্দনা ছন্দে-গ্রথিত রূপ ও গুণ বর্ণনা মাত্র। সরস্বতীর ধ্যান—

"তরুণ শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ ;
কুচভরণমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে
নিজকর কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকল বিভব সিদ্ধৈঃ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।"

লক্ষ্মীর ধ্যান—

"পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্য্যাম্য সৌম্যয়োঃ
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়াং ত্রৈলোক্য মাতরম্
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাম্
রৌক্স-পদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥"

দক্ষিণা কালীর ধ্যান—

"করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ বামাধোর্ধ্ব করাম্বুজাম
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধ পাণিকাম্।"

আমি তিনটি মাত্র ধ্যান উদ্ধৃত করিলাম, এই রূপ বহু দেবতার বহু ধ্যান বর্ণিত আছে। সবই রূপ-বর্ণনা সবই গুণ-বর্ণনা। অন্যান্য দেশেও দেব-দেবীর প্রশংসা রূপ-বর্ণনা ও গুণ-বন্দনার বর্ণাঢ্য প্রকাশ। চিরাচরিত এই রীতি অবলম্বন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালও তাই গাহিয়াছেন,—

"সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে, অমল কমল আনন দীপ্ত
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র
মন্ত্র-মুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্দ্র।"

গাহিয়াছেন—

"মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড় ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কানন তীর
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী-শ্রীর
শৌর্যে স্নেহে ও শুভ্র চরিতে কে সম মেবার সুন্দরীর।"

গাহিয়াছেন—

"ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে
তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠে পাখীর ডাকে জেগে
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়

কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।"

গাহিয়াছেন—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ
তার কি না এই ধূলায় আসন তার কি না এই ছিন্নবেশ
উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি—চণ্ডীদাসও গাহিল গান—"

'আমার মা কত সুন্দর' 'আমার মায়ের কত গুণ'—একথা নানাভাবে বলিয়া বলিয়াও তাঁহার যেন তৃপ্তি হয় নাই। স্বদেশ-প্রেমিক সব বড় কবিই দেশমাতার রূপবর্ণনা করিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন—। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানটি মনে করুন

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনী
অয়ি নির্মল সূর্য-করোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননীজননী
নীল সিন্ধুজল-ধৌত চরণতল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনী!"

কিম্বা গোবিন্দ দাসের—

"উত্তরে চাহিনু ফিরা দূর হিমাচলে
জন্মেছে জাহ্নবী শত পুণ্য পদতলে
সে অমৃত বারি স্পর্শে চিতায় চিতায়
সগর-বীরের বংশ জাগে পুনরায়।

আবার চাহিনু ফিরা সুদূর পশ্চিমে
কুঙ্কুমে কুসুম হাসে দুধ-জমা হিমে
ইরাবতী চন্দ্রভাগা শতদ্রু বিপাশা
গদ গদ পঞ্চনদে নাহি ফোটে ভাষা !"

কিম্বা দেবেন্দ্রনাথ সেনের শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরীর বর্ণনা—

"শ্যামাঙ্গী বরষা আজি বিহ্বলা মোহিনী সাজি
এলায়ে দিয়েছে তার মসীবর্ণ কালো কালো চুল
শ্রীকণ্ঠে পরেছে বালা অপরাজিতার মালা
দু কর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুমকার ফুল
নীলাম্বরী শাড়িখানি পরি
অপূর্ব মল্লার রাগ ধরেছে সুন্দরী—"

কিম্বা কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের—

"ভরা কোটি জ্যোতিষ্কেতে মহান নীলাকাশ
মোদের আকাশ সেই যেখানে ধ্রুবতারার বাস
মোদের আকাশ স্বচ্ছ সুনীল দিব্য নীলাম্বর
রাকা চাঁদের সুধার সায়র, রামধনুকের ঘর
কোথায় মোরা ক্ষুদ্র অণু, কোথায় মহাকাশ
আমরা ঘটে-পটেই দেখি তাহার যে বিকাশ—"

কিম্বা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর—

"এ কি দশ-ভুজা মূর্তি ! দশভুজে দশ প্রহরণ
অক্ষম সন্তান তরে স্নেহ-ধর্মে দশদিক করিয়া রক্ষণ
লক্ষ্মীর ঐশ্বর্যরাশি ধনে-ধান্যে দশদিশি উঠে উছলিয়া
বিদ্যাদাত্রী ভারতীর বরবাণী নিঃস্যন্দিত শ্রবণ ভরিয়া
মরি মরি এতরূপ—এত শোভা জননীর কে দেখেছে কবে ?"

কিম্বা কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ভাদুরানী এস ঘরে' কবিতায়—

"নিভায়ে তপন ভাদর গগন ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে
সঘনে গরজি বিজলী চমকে ভ্রূকুটি হানে সে রেগে

হেরি বাদরের ক্ষণিক ক্ষান্তি পাখী কলতান ধরে
এ হেন বাদরে আদরিনী মেয়ে ভাদুরানী এস ঘরে।

*   *   *   *

ঘন বাড়ন্ত আখের পাতায় আলিপথ গেছে ঢেকে
কাঁকড়া-শামুক-মাছ-ব্যাঙে ভরা নালী গেছে এঁকে বেঁকে
আজি পাট-ক্ষেতে হাতী ডুবে যায়! মন যে কেমন করে
কাঁদিছে দাদুরী আদরিনী মেয়ে ভাদুরানী এস ঘরে।"

কিম্বা কবি করুণানিধানের—

"ভো মহার্ণব নীল ভৈরব
গর্জদ্-জল ভঙ্গে
দূর অম্বুদ-মন্দ্র সমান
তুলিতেছ কার বন্দনা গান
নক্তন্দিব উদ্বোধনের
দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।"

এ সমস্তই দেশের রূপ বর্ণনা। বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত বড় কবিই মায়ের রূপ বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত। হইতে পারে এসব কেবলমাত্র ভৌগোলিক বর্ণনা, কিন্তু দেশের ভূগোল লইয়াই সব দেশের কবিরা পাগল। টেমস, টাইবার নদী ও আল্‌পস পর্বত লইয়া ওদেশের কবিদেরও উচ্ছ্বাস কম নহে। দ্বিজেন্দ্রলালও এই উচ্ছ্বাসেই প্রমত্ত, মায়ের এই বাহিরের রূপেই তিনি তন্ময়। কিন্তু তাঁহার বর্ণনায়, তাঁহার অপরূপ ছন্দের ঝঙ্কারে, তাঁহার বক্তব্যের বিদগ্ধ স্বচ্ছ ঋজু মহিমায় তাঁহাকে অনন্য করিয়াছে। তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের দীপ্তি তাই আজও দেশের লোকের মনে ঝলমল করিতেছে, চিরকাল করিবে।

সব দেশেরই একটা অন্তরের দিক থাকে, যাহা তাহার বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, যাহাতে তাহার চরিত্রের পরিচয় দেদীপ্যমান। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ইংরেজদের বৈশিষ্ট্য যেমন তাহাদের

বণিক বৃত্তি, ফরাসীদের বৈশিষ্ট্য যেমন তাহাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তায়, —ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য তেমনি ধর্মে।[৪] রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যকে মূর্ত করিয়া গিয়াছেন। একটি মাত্র সনেটে তিনি সে বৈশিষ্ট্যের যে রূপ-প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছেন তাহা অপরূপ, অনবদ্য, অতুলনীয়।

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট-দণ্ড সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম যুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগ-যুক্ত চিতে
সর্বফল স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু, অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখ সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

ভারতের সংস্কৃতি, বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস—বস্তুত ভারতের সমস্ত মহিমা এই ক্ষুদ্র কবিতাটিতে বিধৃত। কোনও স্বদেশ-প্রেমিক বড় কবি দেশের অন্তরের বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। দ্বিজেন্দ্র-লালও পারেন নাই। তাঁহার নাটকগুলির বহু চরিত্রে উক্ত কবিতার ভাবরাশি জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া মঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি আমাদের জাতীয় মহত্ত্বকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে একটি কবিতায় আবদ্ধ করেন নাই—বহুরূপে স্ফূর্ত করিয়াছেন।

(৪) দ্রষ্টব্য :—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃ ১৯-২৩

রাণা প্রতাপ সিংহ, দুর্গাদাস, যোশী, সত্যবতী, অজয়, সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহ, গৌতম, রামচন্দ্র, সীতা প্রভৃতি চরিত্র ভারতীয় মহিমাকে মূর্ত করিয়াছে। মুসলমান দিলীর খাঁ এবং মহাবৎ খাঁর চরিত্রেও তিনি সেই মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এমন কি ভ্রাতৃ-ত্যাগী শক্ত সিংহও শেষ পর্যন্ত ওই মহিমায় অভিভূত হইয়া ভ্রাতৃ-সন্নিধানে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলি—সে যুগে এবং এখনও আমাদের মনকে স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতের মহত্ত্ব কোথায়, ভারতের সূর্য কোন আকাশ হইতে স্বর্ণ-কিরণ বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়াছে তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি মঞ্চে দেখিলে (এমন কি ঘরে বসিয়া পড়িলেও) আমরা অনুভব করিতে পারি। স্বদেশী আন্দোলনে দেশের সুপ্ত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির ভূমিকা, তাঁহার প্রতাপ সিংহ, মেবার পতন নাটকে চারণ-চারণীদের ভূমিকার মতো, সমরাঙ্গনে তূর্যধ্বনির মতো, আবেগময়, প্রাণময়, সঞ্জীবনী মন্ত্রোচ্চারণের মতো। তাহা আমাদের মনকে মাতাইয়া দেয়, তাতাইয়া দেয়, উল্লসিত করে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের দুরূহ পথে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানগুলি চিরন্তন পাথেয় সরবরাহ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের সুরগুলিও তাঁহার নিজের দেওয়া। সে গান শুনিলেই সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কবিশেখর কালিদাস রায় ঠিকই বলিয়াছেন,—"বঙ্গ আমার জননী আমার"—এই গানটি শুনে বাঙালী প্রথম বুঝল ঐ গানের কবিত্বটাই বড় নয়, তার চেয়ে ঢের বড় ওর সুর, যে সুর তারা আগে কখনও শোনে নি। গানের সুর যে হৃদয়কে এ ভাবে জাগিয়ে তাতিয়ে মাতিয়ে তুলতে পারে তা তারা কখনও কল্পনা করেনি। এ গান তার সুরবাহন-সহ একদা প্রত্যাদেশের মতোই তাঁর কণ্ঠে আবির্ভূত হয়—যেন বাল্মীকির কণ্ঠে প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মতো।…দ্বিজেন্দ্রলালের এই গান বাংলার সহস্র সহস্র তরুণ হৃদয়কে শুধু যে অনুপ্রাণিত করেছিল তাই নয়, তরুণ হৃদয়কে জাতীয়

সংগ্রামে, বহু দেশভক্তকে সর্বস্ব উৎসর্গ করতেও প্রণোদিত করেছিল। এই গান দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে একক আবির্ভূত হয়নি, তার পিছু পিছু এল 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ'। এলো 'ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র'—ইত্যাদি।...উত্তরাধিকার সূত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার সঙ্গীতানুরাগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন স্রষ্টা, তাই তাঁর পূর্বসূরীদের পুনরাবৃত্তি বা অনুকরণকে স্বধর্ম মনে করতেন না।...তিনি বাংলার নিজস্ব সুরধারার সঙ্গে ওস্তাদি ধারা মিলিয়ে নতুন সুর সৃষ্টি করলেন এবং তাদের উপযুক্ত বাহনেরও সৃষ্টি করলেন। তাঁর সুরধুনীর মকরও তাঁরই আবিষ্কার' [৫]।

সুরে গানে কবিতায় নাটকে দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল স্বকীয়তার সিংহাসনে সম্রাটের মতো সমাসীন হইয়া আছেন। অনেকে বলেন দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, দ্বিজেন্দ্রলালের গান—'বড্ড বেশি senti-mental'। এই সব সমালোচকদের মধ্যে অনেকে সত্যকার রসিক লোক আছেন। কিন্তু তাঁহারা রসিক হইলেও ভীরু। তাঁহারা আকাশে মেঘ দেখিলে ঝড়বৃষ্টির ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করিয়া দেন, তেল-ঘি-মসলা দেওয়া গরগরে তরকারির বদলে স্ট্যু কিম্বা সিদ্ধ খান, দোলের দিন রঙের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া বাস করেন, কোন প্রকার উত্তেজনা, উদ্দীপনা, হৈ চৈ বরদাস্ত করিতে পারেন না। ইঁহারা সাধারণত নিজেদের intellectual বিশেষণে ভূষিত করিয়া গর্ব অনুভব করেন। J. R. Lowell নামক একজন রসিক বিদেশী সাহিত্যিক কিন্তু বলিয়াছেন —"Sentiment is intellectualised emotion; emotion precipitated, as it were in pretty crystals by the fancy" [৬]

(৫) দ্বিজেন্দ্র-কাব্যসঞ্চয়ন পৃ ৫-৮

(৬) Dictionary of thought PP. 588

রসিক মাত্রেই জানেন এই সব pretty crystals-ই কাব্যকে অলঙ্কৃত করে। বস্তুত কাব্য মাত্রেই sentiment-এর প্রকাশ, কোনও কবির সে প্রকাশ হয়তো কম, কাহারো বা বেশি। কিন্তু sentiment না থাকিলে কাব্যই হইবে না। সেন্টিমেণ্ট বর্জিত একরূপ কাব্য আছে বটে, কিন্তু সেসব কাব্য লবণ-বিহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় বিস্বাদ।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশ-প্রেমে দেশকে মাতাইবার জন্যই sentimental নাটক লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মভাব যেখানে দেশের লোকের মর্মে প্রবেশ করিতে পারে নাই দ্বিজেন্দ্রলালের বর্ণ-বহুল সেন্টিমেণ্ট অনায়াসে সেখানে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের যে সব গান বা কবিতা স্বদেশা আন্দোলনের সময় রচিত হইয়াছিল সেগুলিও সেন্টিমেণ্ট-রঙীন।

অনেকের মতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশা নাটকগুলি অত্যন্ত বেশি sentimental বলিয়া নাকি উচ্চশ্রেণীর নাটক-পর্যায়ভুক্ত নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীকে চিনিতেন, দেশের থিয়েটার সম্প্রদায় এবং নট-নটীরাও তাঁহার অপরিচিত ছিল না। ইহাদের সহিত খাপ খাওয়াইয়াই তিনি নাটক লিখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নাটক যেন অভিনয়-সাফল্য অর্জন করে। তাহা না করিলে সবই বৃথা। বিখ্যাত নাট্যকার J. B. Priestley তাঁহার 'The Art of the Dramatist' প্রবন্ধে এই সত্য কথাটা অতি সুষ্ঠুভাবে বলিয়াছেন। —"A dramatist writes for the Theatre. A man who writes to be read and not to be performed is not a dramatist. The dramatist keeps in mind not the printer but a company of actors, not readers but play-goers. He is as closely tied to the theatre as a chef is to a kitchen. His ultimate object, even though, he cannot

achieve it by himself, is the creation of something I shall call the 'dramatic experience'. [৭]......দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকগুলিতে এই 'dramatic experience সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলি বারংবার শত শত মুগ্ধ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনীত হইয়াছে। তাহাদের হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ কম্পিত হইয়াছে, তাহাদের স্বত-উৎসারিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়াছে! এই বিচারে তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। নাটকের মাধ্যমে তিনি জনসাধারণের চিত্তে ভারতবর্ষের আদর্শ মূর্ত করিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য তিনি মহৎ নাট্যকারও।

দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রবর্তী নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও এই একই হিসাবে মহৎ নাট্যকার। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদও কয়েকটি যুগান্তকারী নাটক লিখিয়া অভিনয়-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। 'আলিবাবা' অপেরাকে সমালোচকের লেন্সের তলায় ফেলিয়া বিচার করিলে হয়তো অনেক দোষ ধরা পড়িবে, কিন্তু নাট্যজগতে আলিবাবা মৃত্যুঞ্জয়—ওই জাতীয় নাটকের জোড়া বাংলা সাহিত্যে আর নাই। নাটকের জগৎ একটা আলাদা জগৎ। সে জগতের সহিত সাহিত্য-পাঠক-জগতের কোনও সম্পর্ক থাকিবেই, থাকিতেই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। নাট্যকার নাট্যামোদীদেরই আরাধ্য। নাট্যকার তাঁহার নাটক লইয়াই মাতিয়া থাকেন, তিনি জনতার চারণ, জনতার কবি বটে, কিন্তু জনতার সঙ্গে বা সমাজের হোমরা চোমরাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় না। কারণ তিনি সাধক। মহাকবি মহানাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া অধ্যাপক ডক্টর মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন......... 'Shakespeare was for about twenty years engrossed in his professional work in London almost losing

(৭) The Art of the Dramatist by J. B. Priestley P. 8.

touch with all strata except the world of players and authors. His detachment, as reflected in his work, is probably traceable to this fact. Had he been more intimate with royalty and the court he would have been another Beaumot or another Fletcher" [৮]: দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। একটা গানে তিনি নিজেই একথা বলিয়াছেন

"জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান— ।"

"আমি কারো তোয়াক্কা করি না বাবা" এই ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের সুর। তাই তাঁহার শত্রু জুটিয়াছিল অনেক। শেক্‌সপীয়রেরও জুটিয়াছিল। ভলতেয়ারের মতো লোকও তাঁহার বিরুদ্ধ-সমালোচক ছিলেন; [৯] টলষ্টয়—'was also a carping critic or Shakespeare' [১০] কিন্তু এসব সত্ত্বেও মহাকবি মহানাট্যকার শেক্‌সপীয়র নিজস্ব স্বকীয়তায় আজও বিশ্ব-সাহিত্য-দর্পণে সমুজ্জ্বল। ইহার কারণ ডক্‌টর ভট্টাচার্য উক্ত প্রবন্ধেই বলিয়াছেন—"Shakespeare is universal and reflects the spirit of humanity. He transcends narrow interests, appeals and consideration and rises to a higher place. ......In Elizabethan England he wrote for the nation, not only for the masses or for the gentry or the nobitily."

Shakespeare-ও কাহারও তোয়াক্কা করিতেন বলিয়া মনে

(৮) Elizabethan stage and Audience and Shakespear's plays; —Lecture delivered in the Arts college Pilani by Dr. M. M. Bhattacherjee.

(৯) ঐ

(১০) ঐ

হয় না। তিনি নাটকের জগতে সেই great art লইয়া তন্ময় ছিলেন যাহার সম্বন্ধে ডঃ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন—"One criterion of greatness of art is its capacity to attract the interests of the people in the most comprehensive sense of the expression." ১১

দ্বিজেন্দ্রলালও শেক্‌সপীয়রের সমধর্মী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক সমালোচকেরা তাঁহার নাটক ও স্বদেশী সঙ্গীতগুলির বিচারে সব সময় যে বিশুদ্ধ পক্ষপাতহীন সাহিত্য-বুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন একথা মনে হয় না। কিছু ঈর্ষা, কিছু পরশ্রীকাতরতা, কিছু অভিভাবকী ভঙ্গীতে পিঠ চাপড়ানো—এ সবও ছিল। তাই তাঁহার জীবনে যে সম্মান পাওয়া উচিত ছিল সে সম্মান তিনি পান নাই। শেক্‌স্‌পীয়রও পান নাই।

শেক্‌স্‌পীয়রও পাইয়াছিলেন ঈর্ষা ও ক্রোধ। "His growing popularity as a playwright excited the anger and jealousy of Green." ১২ দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনেও এসব ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যে 'বিম্ববতী' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। সে কবিতায় রানী বার বার নানাসাজে সাজিয়া মন্ত্র-পড়া মায়াময়কনক-দর্পণের সম্মুখে বারবারই প্রশ্ন করিতেছে—"সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে"। কিন্তু হায় দর্পণে বারবার যে ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা তাঁহার ছবি নয় তাঁহার সতীনের মেয়ে বিম্ববতীর 'মধুমাখা হাসি-আঁকা' মুখ। অবশেষে রানী দর্পণ দূরে ফেলিয়া দিয়া রাগে হতাশায় হিংসায় প্রাণত্যাগ করিলেন—কিন্তু দর্পণে তখনও বিম্ববতীর হাসিমাখা মুখটিই ফুটিয়া রহিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধ সমালোচকরা আর নাই, দ্বিজেন্দ্রলালও আর নাই—কিন্তু মহাকালের দর্পণে স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের

(১১) ঐ

(১২) ঐ

নাট্য-প্রতিভার অম্লান মহিমার 'বিম্ববতী' আজও ঝলমল করিতেছে। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল ছটায় বঙ্গসাহিত্যের আকাশ এবং বঙ্গবাসীর চিত্ত আজও প্রদীপ্ত।

এই স্বদেশপ্রেমের জন্য তিনি অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজ উপর ওয়ালারা এজন্য তাঁহার উপর রুষ্ট ছিলেন। যোগ্যতা সত্ত্বেও ভালো পদে তিনি অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। এই স্বদেশপ্রেমের জন্যই—বস্তুত স্বদেশের মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষাতেই রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'যৌবনস্বপ্ন' নামক পুস্তকের কয়েকটি কবিতা তিনি লালসা-ক্লিন্ন মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবান কবি যদি এই ধরণের কবিতা লেখেন দেশ উৎসন্নে যাইবে। তাঁহার এই মতবাদ ভুল কি নির্ভুল তাহা আলোচনা করিব না। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে দেশের ও সাহিত্যের মঙ্গলের জন্যই তিনি এই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এজন্য রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। ইহা তাঁহার পক্ষে সুখের ছিল না। বিশেষ করিয়া এই জন্য যে, তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। যাহা করিয়াছিলেন তাহা কর্তব্যবোধেই করিয়াছিলেন, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য করিয়াছিলেন। কোনও প্রেমের পথই কুসুমাস্তীর্ণ নহে। স্বদেশ-প্রেমের তো নহেই। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি—যখন তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল তখন। কল্পনায় তিনি স্বদেশকে মহিমার শিখরে তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁহাকে বারবার আবিষ্কার করিতে হইয়াছে দেশ দুর্দশার নরককুণ্ডে শায়িত। যাহাকে রাজরাণী ভাবিয়াছিলেন আসলে সে ভিখারিণী। তাঁহার স্বদেশবাসীর মধ্যে রাণাপ্রতাপ সিং বা দুর্গাদাস বিরল, কিন্তু উঁমিচাঁদেরা অজস্র। অবশেষে তাই তাঁহাকে গাহিতে হইয়াছে—

"কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মানুষ হ'
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ'
পরের 'পরে কেন এ রোষ নিজেরই যদি শত্রু হ'স
তোদের এ যে নিজেরই দোষ আবার তোরা মানুষ হ'।"

কিন্তু তবু তিনি রণক্ষেত্র হইতে কখনও পলায়ন করেন নাই, তাঁহার স্বদেশপ্রেমের সুর কখনও নিস্তেজ হয় নাই, কখনও মন্দের সহিত তিনি আপোস করেন নাই, নিজের লাভ ক্ষতির দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই, আমরণ সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারই ভাষায়—

"সেথা নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন সে ভীম সমর মাঝে
সেথা রুধির-রক্ত অসিত অঙ্গে
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে
তীব্র আর্তনাদের সঙ্গে বিজয়-বাদ্য বাজে।"

স্বদেশ-প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে আর্তনাদের সঙ্গেই বিজয় বাদ্য বাজিয়াছে। কিন্তু আর্তনাদ তাঁহাকে দমাইতে পারে নাই, বিজয়-বাদ্যের উন্মাদনায় তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। তিনি প্রেমিক ছিলেন, তিনি স্বদেশকে জাগাইতে আসিয়াছিলেন, তাহার স্বদেশী সঙ্গীতগুলি এখনও তাঁহার দেশবাসীকে জাগাইতেছে। তাঁহারই রচিত একটি কীর্তনের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করি—

"ওকে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়
পথে পথে ওই নদীয়ায়—
ওকে যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে
ওকে দেবতা-ভিখারী মানব-দুয়ারে
দেখে যারে তোরা দেখে যা—"

ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলাল

মানব সভ্যতার শোভাযাত্রায় সাহিত্যের আবির্ভাব যখনই ঘটিয়া থাকুক তখন হইতেই আমরা রঙ্গ-ব্যঙ্গের কিছু কিছু আভাস পাই। রঙ্গ-ব্যঙ্গ মানব-মানসের অপরিহার্য প্রয়োজন। যাহা অশোভন যাহা অন্যায় যাহা স্বার্থ-বিরোধী তাহার বিরুদ্ধে মানব চিরকালই প্রতিবাদ জানাইয়াছে। প্রতিবাদ জানানোটাই জীবন্ত প্রাণের লক্ষণ। আদিম মানব নখ-দন্ত বিস্তার করিয়া সে প্রতিবাদ করিত, সভ্য মানবও যুদ্ধক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নখদন্ত বিস্তার করে, কিন্তু তাহার সাহিত্যিক রূপ রঙ্গ-ব্যঙ্গ। অতি প্রাচীনকালের সাহিত্যেও রঙ্গ-ব্যঙ্গের বর্ণ-বিন্যাস কখনও প্রচ্ছন্নরূপে কখনও বা অতি প্রকট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশোপনিষদের এই শ্লোকটির কথাই ধরুন

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
তত ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রত।"

যাহারা অবিদ্যার উপাসক তাহারা অন্ধ তমোলোকে প্রবেশ করেন। কিন্তু পরের লাইনেই শ্লেষ করিয়া বলিতেছেন যাঁহারা বিদ্যায় রত তাঁহারাও প্রবেশ করেন অধিকতর অন্ধকারে। আমার মনে হয় এই শ্লোকটির মধ্যে ব্যঙ্গের স্ফুলিঙ্গ আছে।

রামায়ণে রাবণের মহিমাকে ধূলিসাৎ করিয়া বীর হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড, রাবণের দরবারে আসন না পাইয়া লাঙ্গুল পাকাইয়া বিরাট মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর উপবেশন—এ সমস্তই ব্যঙ্গ-রসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কালনেমির লঙ্কাভাগের কথা এখনও ওই জাতীয় ধূর্তকে দেখিলেই আমাদের মনে পড়ে।

মহাভারতেও ব্যঙ্গরস কম নাই। বড় বড় রথী মহারথীরা দুর্যোধনকে পাপী জানিয়াও নিমকের খাতিরে তাহার পক্ষ ত্যাগ

করেন নাই, দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ কালেও তাঁহাদের ধৈর্য বিচলিত হয় নাই 'প্রভুর পদে সোহাগ মদে দোদুল কলেবর' তাঁহারা নিজ নিজ আসনে অলজ্জিত হইয়া সমাসীন রহিলেন। ইহাও মস্তবড় একটা ব্যঙ্গ। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে—জাতকে, হিতোপদেশে, পঞ্চতন্ত্রে, কথাসরিৎসাগরে—ব্যঙ্গের বহু নমুনা পাওয়া যাইবে। বিদেশের সাহিত্য 'আরব্য-উপন্যাস'তো রঙ্গ-ব্যঙ্গের একটি খনি। বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের মধ্যে মহাকবি কালিদাস ছিলেন। সুতরাং সে সভা যে সাহিত্যিক রঙ্গ-ব্যঙ্গের হাস্যকলরবে মুহুর্মুহু মুখরিত হইত এ কথা অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না। যে পুরুষকার লইয়া আমাদের এত গর্ব সেই পুরুষকারকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন কবি কালিদাস। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

নেতা যস্য বৃহস্পতিঃ প্রহরণং বজ্রং, সুরাঃ সৈনিকা
স্বর্গো দুর্গং, অনুগ্রহঃ খলু হরেরৈরাবতো বাহনঃ
ইত্যাশ্চর্য বলান্বিতোঽপি বলিভি র্ভগ্নঃ পরৈঃ সঙ্গরে
তদ্ব্যক্তং ননু দৈবম্ এব শরণং ধিক্ ধিক্ বৃথা পৌরুষম্।

[বৃহস্পতি যাঁহার নেতা, বজ্র যাঁহার অস্ত্র, দেবতারা সৈনিক, স্বর্গ যাঁহার দুর্গ, শ্রীহরির অনুগ্রহ যিনি লাভ করিয়াছেন, ঐরাবত যাঁহার বাহন এই প্রকার অদ্ভুত বলশালী সুরপতি ইন্দ্রও যুদ্ধকালে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে দৈবই মানুষের একমাত্র শরণ ; পুরুষকারকে ধিক্]

সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যঙ্গের এরূপ বহু নিদর্শন আছে। আর একটি অনুরূপ শ্লোক মনে পড়িতেছে। শ্লোকটির রচয়িতা কে জানি না—

পিযুষেণ সুরাঃ শ্রীয়া মধুরিপু, মর্য্যাদায়া মেদিনী
শক্রে কল্পরুহে, শশাঙ্ক কলয়া শ্রীশঙ্কর তোষিত,
মৈনাকাদি নগা মামোদরগতা স্নেহেন সংবর্ধিতা
মঞ্জুলিকরণে ঘটোদ্ভব মুনি কে না পি নো বারিতা।

সমুদ্র দুঃখ করিয়া বলিতেছেন :—আমি দেবতাদের সুধা দিয়াছিলাম, ভগবানকে লক্ষ্মী দিয়াছিলাম, পৃথিবীকে মর্যাদা দিয়াছিলাম, ইন্দ্রকে কল্পতরু দান করিয়াছি, মহাদেবের ললাটে চন্দ্র-কলা স্থাপন করিয়াছি, মৈনাক প্রভৃতি নগেরা যখন ভয়ে আমার উদরে আশ্রয় লইল, তখন আমি তাহাদের সস্নেহে সংবর্ধিত করিয়াছি। কিন্তু ঘটোদ্ভব মুনি অর্থাৎ অগস্ত্য ঋষি যখন গণ্ডুষে আমাকে পান করিতে উদ্যত হইলেন কেহই আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিল না।

ব্যঙ্গরসের এরূপ আরও বহু শ্লোক আছে, যথা—

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য
একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।

কাকের ঠোঁট যদি সোনার হয়, দুই পায়ে যদি মাণিক থাকে প্রত্যেক ডানা যদি গজরাজ-মুক্তা-শোভিত হয়—তবু কাক কাকই থাকে, রাজহংস হয় না। ভবভূতির এই বিখ্যাত শ্লোকটি শুনুন—

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ, মা লিখ।

হে ব্রহ্মা, অন্য যাহা কিছু দুঃখ তুমি দাও সহ্য করিব।
কিন্তু অরসিকের কাছে রসনিবেদনের দুঃখ আমাকে দিও না।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য এরূপ শত শত ব্যঙ্গ রচনায় অলঙ্কৃত। আকবর বাদশাহের সভায় বীরবল ছিলেন। তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গ প্রদীপ্ত শাণিত ও বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। আকবর বাদশাহের মহিমা ম্লান হইয়া আসিয়াছে কিন্তু রসের জগতে আজও বীরবল অমর হইয়া আছেন। গোপাল ভাঁড়কেও আমরা ভুলি নাই। কাব্যশাস্ত্রে যে দশটি রসের উল্লেখ আছে তাহাতে ব্যঙ্গ রসকে কোনও পৃথক স্থান দেওয়া হয় নাই। ব্যঙ্গ রস বস্তুত একটি রস নহে। একাধিক রসের সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। হাস্য, রৌদ্র, এবং অদ্ভুত এই তিনটি রসের প্রভাবই ব্যঙ্গরসে কিছু কিছু আছে। এই ব্যঙ্গ রসে বাঙালীর জীবন অভিষিক্ত। যে সব প্রবচন, প্রবাদ ও ছড়া

লোকমুখে বাঁচিয়া আছে তাহাদের মধ্যেও ব্যঙ্গরসের ছড়াছড়ি। 'কত সাধ যায়রে চিতে মলের আগে চুটকি দিতে' 'কানা গরুর ভিন্ন গোয়াল' 'থাকরে কুকুর আমার আশে ভাত দিব তোরে পৌষমাসে' 'ধান নাই চাল নাই আন্দিরাম মহাজন' 'নিজের বেলায় আঁটি সাঁটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি'—ব্যঙ্গরসের এরূপ অনেক প্রবচন বাঙালীর মুখে মুখে আজও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় এইরূপ একটি প্রবচন সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-রসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ওই সংগ্রহে ব্যঙ্গপ্রিয় বাঙালীর ব্যঙ্গপ্রবণতার অনেক উদাহরণ মিলিবে। ছোট ছোট ছড়াতেও ব্যঙ্গরসের ছড়াছড়ি : যেমন "আম শুকালে আমসী : যৌবন ফুরালে কাঁদতে বসি"—কিম্বা

"ঠকিলাম লো দিদি ঠকিলাম লো
হাটে বাজারে গিয়ে মিশি কিনে আনিয়ে
আয়না খুলিয়া দেখি দাঁত নাহি লো!"

এই ছড়াটি সাহিত্যিক বাংলায় আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে ঠিক এই রূপ দিতে পারি নাই। আর একটি শ্লোকেরও করিয়াছিলাম—শ্লোকটি মনে নাই। অনুবাদটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"দারোগা হইল যবে গোবর্ধন গোফ,
শালা তার সেই সূত্রে রাখিলেন গোঁফ।"

আমাদের সামাজিক জীবনে শালা-শালী-বউদিদি-বেয়াই বেয়ানদের সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক সে মাধুর্যের মধ্যে ব্যঙ্গ পরিহাসের আমেজ কম নয়। বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি লোকসাহিত্য হাস্যরসে ও ব্যঙ্গরসে ভরপুর। অতি প্রাচীন কালের সাহিত্যেও ইহার অনেক উদাহরণ আছে। কবিশেখর কালিদাস রায় বলিয়াছেন "কিন্তু তা সভ্যজনের উপভোগ্য নয়। তাতে আছে সঙের খেলা, ভাঁড়ামি, অশ্লীলতা এবং গালাগালি। প্রাকৃত জনসমাজে এসব হাস্যরসের রচনা বলে গণ্য হয়েছিল। এই কদর্যতা চরমে

উঠেছিল কবির লড়াইয়ে ও খেউড়ে”। ১ প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে না উল্লেখ করিয়া পারিতেছি না। বর্তমান-যুগে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার পর যাহা সভ্যজনের ‘উপভোগ্য’ হইয়াছে দেখিতেছি তাহাও কম অশ্লীল বা কদর্য নহে। পথে ঘাটে স্টেজে সিনেমায় মঞ্চে উৎসবে ব্যসনে কামিনীদের যে সব আবরণ-থাকা-সত্ত্বেও উলঙ্গিনী মূর্তি দেখি, নাম-করা সাহিত্য-পত্রিকাগুলিতে যে ধরণের অশ্লীল কদর্য গল্প উপন্যাস ছাপা হয়, আর্টের নামে এবং ফোটোগ্রাফির কৌশলে যে-ধরণের নির্লজ্জ ছবির আবির্ভাব প্রত্যহ দেখি, তাহাতে মনে হয় আধুনিক সভ্যজনের উপভোগের মানদণ্ড নিশ্চয়ই বদলাইয়াছে। যাঁহারা পূর্বে ‘বাইনাচ’ দেখিয়াও শিহরিয়া উঠিতেন, তাঁহারাই আজকাল টাইট-প্যাণ্ট পরা যুবতীর টুইস্ট নাচ বা হুলাহুলা নাচ অবিচলিত ভাবে বসিয়া দেখিতে সক্ষম। এই মানদণ্ডে বিচার করিলে সেকালের খিস্তি খেউড়ও সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য। সেকালের ওই কবিরা সব সময়ই অশ্লীল কবিতা লিখিতেন না। বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রা (১৭৭৫—১৮৫১) জাড়াগ্রাম প্রসঙ্গে চাটুকার যজ্ঞেশ্বর ধোপাকে গানে যে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন তাহা এ যুগের মার্জিত শ্রবণে হয়তো খুব বেশি বেসুরা মনে হইবে না।

“কেমন করে’ বললি জগা জাড়া গোলক বৃন্দাবন
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা চৌদিকে তার বাঁশের বন।
... ...
বাবুতো বাবু লালাবাবু কোলকাতাতে বাড়ি
বেগুন পোড়ায় নুন দেয়না এ বেটারা তো হাড়ী
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায় মুফতের মধু অলি
মাপ কর গো রায় বাবু ছুটো সত্যি কথা বলি
জগা ধোপা খোশামুদে অধিক বলব কি
তপ্তভাতে বেগুন পোড়া পান্তা ভাতে ঘি॥”

(১) দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন পৃঃ দ

কবি মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে রঙ্গ-ব্যঙ্গের নিদর্শন অনেক আছে। মুরারি শালের আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া সে কালের খল কপট বণিক সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন মুকুন্দরাম। কালকেতু বাড়িতে আসিয়াছে ভাবিয়া মুরারি সঙ্গে সঙ্গে পলাতক

'বেনে বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল
লেখা-জোখা করে টাকাকড়ি
পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বেড়া
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি।"

কিন্তু মুরারির স্ত্রী পলাইল না। সে আগাইয়া আসিয়া বলিল :

'বীরের শুনিয়া বাণী হাস্যে বলে বাণ্যানী
ঘরেতে নাহিক পোতদার
প্রভাতে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের উধার
আজি, কালকেতু যাও ঘর।'

শুধু তাহাই নয়, ধার তো শোধ করিলই না আরও দুইটা ফরমাস করিল :

'কাষ্ঠ আন্য একভার একত্র শুধিব ধার
মিষ্ট কিছু আঁনিও বদর।'

চতুর বণিকের স্ত্রী আরও চতুর। মুরারি শীলের চরিত্রটি রঙ্গে-ব্যঙ্গে চমৎকার। কবিকঙ্কণের গুজরাট নগরে প্রজাপত্তন, মুসলমানদের বর্ণনা, সর্বোপরি তাঁহার 'উজ্জ্বল জীবন্ত পাষণ্ড' ভাঁড়ু দত্তের সৃষ্টি তাঁহার ব্যঙ্গ-প্রতিভার পরিচয় দান করে। আজু গোঁসাই অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের কবি। তিনি প্যারডি রচনায় সুদক্ষ ছিলেন। তিনিই অনেকের মতে বাংলাসাহিত্যে প্রথম প্যারডি লেখক। 'এ সংসার ধোঁকার টাটি' কবিতার প্যারডি—'এ সংসার রসের কুটি, খাই দাই আর মজা লুটি'। ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। রায়গুণাকরও তাঁহার সৃষ্টিতে

ব্যঙ্গ রসের অনেক নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝে তিনি উর্দু ফার্সি শব্দও ব্যবহার করিতেন। 'ভট্ট কহে কোতোয়ালে ঐসারে গারি মত দিজিয়ে···সমুঝকে বাত কীজিয়ে।' নীলাচল-লীলা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদের যে ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা এখনও উপভোগ্য :

"খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত নাচিব গাইব কুতূহলে
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।"

বিদ্যাসুন্দরে রঙ্গব্যঙ্গ হাস্য-রসের অভাব নাই। সুন্দরকে দেখিয়া নারীদের পতি-নিন্দা উপলক্ষে কবির প্রতি কবি-পত্নীর ব্যঙ্গোক্তি :

"মহাকবি মোর পতি কত রস জানে
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে
পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র যোগাইতে নারে
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।"

ইহা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতাটা মনে পড়িয়া যায় :

"সেদিন বরষা ঝর ঝর ঝরে কহিল কবির স্ত্রী
রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড় রচিতেছ বসি পুঁথি বড় বড়
মাথার উপরে বাড়ি পড় পড়—তার খোঁজ রাখ কি ?"

বঙ্গ-সাহিত্যের উষাকালে দুইটি প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ রচনার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। 'আলাল' ও 'হুতোম'। ইহাদের সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"আলাল ও হুতোমে আমরা ব্যঙ্গের এক উদার সার্বজনীন বিস্তৃতির পরিচয় পাই।" ইহার পরই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করিতে হয়। তিনি চন্দ্র নহেন সূর্য। তাঁহার উদয়ের সঙ্গে নানা দিকে নানা বিহঙ্গের কাকলী শোনা গেল, কাননে কাননে বিবিধ ফুল ফুটিল—চারিদিকে একটা সাড়া পড়িল, প্রাণ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইল। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন

যুগের সূচনা করিলেন। ব্যঙ্গ রচনার সুস্থ সবল মনোহর গ্রাম্যতা-বর্জিত রূপ তাঁহারই প্রতিভার ভাস্বর দ্যুতিতে বাংলা সাহিত্যকে ভূষিত করিল। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তরে, তাঁহার মুচিরামে, তাঁহার লোক রহস্যে, তাঁহার উপন্যাসের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা চরিত্রে ব্যঙ্গের এবং হিউমারের প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটিল। তিনি অনেক ব্যঙ্গ কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'অধঃপতন' সঙ্গীত হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"যাব ভাই অধঃপাতে কে যাইবি আয় সাথে
কি কাজ বাঙ্গালি নাম রেখে ভূমণ্ডলে
লেখা-পড়া ভস্ম ছাই কে কবে শিখেছে ভাই
লইয়া বাঙ্গালি দেহ এই বঙ্গস্থলে
হংস পুচ্ছ ল'য়ে করে কেরানীর কাজ করে
মুন্সেফ চাপরাশি আর ডিপুটি পেয়াদা
অথবা স্বাধীন হ'য়ে ওকালতি পাশ ল'য়ে
খোসামুদি জুয়াচুরি শিখেছি জেয়াদা
সার কথা বলি ভাই, বাঙ্গালিতে কাজ নাই
কি কাজ সাধিব মোরা এ সংসারে থাকি
মনোবৃত্তি আছে যাহা ইন্দ্রিয় সাগরে তাহা
বিসর্জন করিয়াছি কিবা আছে বাঁকি ?
কেন দেহভার বয়ে যমে দাও ফাঁকি।"

কবিতাটি দীর্ঘ। আমি একটি কলি (stanza) মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক ব্যঙ্গ কবিতার মূল ভাব এই 'অধঃপতন' সঙ্গীতে আছে। অবশ্য সে সবের বলিবার ভঙ্গী বিভিন্ন। বঙ্কিমের ঠিক পূর্বে আরও দুইজন প্রতিভাধর কবি বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গ-রসের আমদানি করিয়াছিলেন—ঈশ্বরগুপ্ত ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন দত্তের দুইখানি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' আজও আমাদের মনে ব্যঙ্গরসের উদাহরণ-

স্বরূপ হইয়া আছে। ঈশ্বরগুপ্ত অনেক ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সে সব কবিতায় তাঁহার পূর্ববর্তী যুগের রং ও গন্ধ রহিয়া গিয়াছে। কবিতাগুলিতে রঙ্গরস থাকিলেও কিছু আঁশটে এবং প্রচুর রসুন পেঁয়াজের গন্ধ আছে। সাত্ত্বিক রুচিবাগীশদের নিকট তাই তাহা আজকাল তেমন সমাদৃত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য ও অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর তিনিই একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়া গিয়াছেন। সে ভূমিকা হইতে অল্প একটু উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের ভক্ত হইলেও সমালোচনার সময় তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টি ভক্তি-ভাবে ঝাপসা হইয়া যায় নাই। তিনি লিখিয়াছেন 'অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতায় এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বর প্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায় অনুপ্রাস-যমকের ঘটায় তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময় একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায় কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া অনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয় পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না।···অনুপ্রাস যমক যে সব সময়ে দুষ্য এমন কথা বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য শুনায় বটে কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময় বড় মধুর।··· বাঙ্গালাতেও তাই।···ঈশ্বরগুপ্তের এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে— বিবিজান চলে যান লবেজান করে'।' ঈশ্বরগুপ্তের দেশ-বাৎসল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। একথা বিশেষভাবে এই জন্য উল্লেখ করিতেছি, কারণ দেশ-ভক্তিই অনেক সময় ব্যঙ্গ-কবিতায় আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-প্রেমই ব্যঙ্গ কবিতায় রূপায়িত হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেশ-বাৎসল্যের উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গলা দেশে—দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর

গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইলেও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন ঃ—

'ভ্রাতৃ ভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।'

তাঁহার কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতার টুকরা উদ্ধৃত করি।

মেম সাহেব দেখিয়া ঃ—

'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে
আহা তায় রোজ রোজ কত 'রোজ' (rose) ফোটে
ঢলঢল টলটল বাঁকা ভাব ধরে
বিবিজান চলে যান লবেজান করে।' (ইংরেজী নববর্ষ)

মহারাণীর স্তুতি-পরায়ণ Agitator-দের কানধরিয়া টানাটানি—

'তুমি মা কল্পতরু আমরা সব বোঝা গরু
শিখি নি সিং বাঁকানো
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গেনা
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব
ঘুসি খেলে বাঁচব না!'

বিলাতী ভাবাপন্ন সাহেব বাবুদের তিনি কম ব্যঙ্গ করেন নাই—

'যখন আসবে শমন করবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে
বুঝি হুট বোলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে—'

এই সব কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক ব্যঙ্গ কবিতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যদিও প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাব এক। আমার মনে হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভার সহিত ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্র-লালের কবি-মানসের খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

ব্যঙ্গ-সাহিত্যের রস-ভাণ্ডারে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের দানও অসামান্য। তাঁহার 'জামাই বারিক' 'সধবার একাদশী,' 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি স্মরণযোগ্য ব্যঙ্গ-রচনা। তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত—'তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাঁহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কাল-ক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।"

ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রভাকর' বঙ্গসাহিত্য গগনে, বহুকাল প্রভাবিকীর্ণ করিয়াছিল। আমার বিশ্বাস দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁহার প্রতিভার আওতায় পড়িয়া-ছিলেন, যদিও তাঁহার ব্যঙ্গরচনায় অভব্য বা অশ্লীল কিছু নাই। ঈশ্বর গুপ্তের সব কবিতাই অশ্লীল নহে। তাঁহার তপ্‌সে মাছের প্রতি কবিতা—

"কষিত কনক-কান্তি কমনীয় কায়
গাল-ভরা গোঁফ দাড়ি তপস্বীর প্রায়
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে।"

কিম্বা বাঙালী মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া লেখা—

'সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি
নশী জশী ক্ষেমি বামী রামী শ্যামী গুলকি।'

এসব কবিতা অশ্লীল নহে। এই ধরণের কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানেও আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো ঈশ্বরচন্দ্রও বাংলা কবিতার মধ্যে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—

'হিপ হিপ হুর্‌রে ডাকে হোল ক্লাস
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক দিস্ গ্লাস।'

দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু পূর্বে রসরাজ অমৃতলালও রঙ্গরসে হাসির নাটকে, ব্যঙ্গ রচনায় বাঙালী সমাজকে মাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার 'খাসদখল' যদিও একটি বিশেষ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত তবু তাহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমসাময়িক ব্যঙ্গকার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের আকাশে Halley's comet—যখন ফুটিয়া ওঠে তখন উহার প্রভায় দশদিক আলোকিত হইয়া ওঠে, পরন্তু সবাই উহাকে দেখিয়া ভয় পায়। কে জানে কাহার কোন্ অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, আর দেশশুদ্ধ লোক তাহা দেখিয়া হাসিবে আর হাততালি দিবে"।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই সমগ্র ইন্দ্রনাথ সাহিত্য আমাদের চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার রচনা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিব না।

অতি সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রসের যে পটভূমিকা রচনা করিলাম সেই পটভূমিকার উপরই ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। বাংলা সাহিত্যের অনেক রসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রঙ্গ-ব্যঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই বৎসরের শারদীয়া কথা-সাহিত্যে কবিশেখর কালিদাস রায়ের আলোচনাটি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রসিকের অতি মনোজ্ঞ সহৃদয় আলোচনা। ব্যঙ্গকারকে সাহিত্যের আমির ওমরাহদের দরবারে সাধারণত বড় আসন দেওয়া হয় না। তাঁহার কৃতিত্বটা কেহ যেন আমলের মধ্যে বা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতে চায় না। Gilbert Highet তাঁহার The Anatomy of Satire গ্রন্থের প্রথম পাতার প্রথম লাইনেই বলিয়াছেন—'Satire is not the greatest type of literature. It cannot,

in spite of the ambitious claims of one of its masters, rival tragic drama and epic poetry.' যে লেখক লেখনীর চাবুক লইয়া অসাধু, ভণ্ড বা চোরকে চাবকান অথবা দশজনের সমক্ষে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাকে অপদস্থ করেন, আহত ও অপমানিত ব্যক্তিরা সে লেখকের প্রতি কখনও প্রসন্ন হইতে পারে না। সর্বদেশের সর্বসমাজেই অসাধু, ভণ্ড ও চোরের সংখ্যা অনেক। সুতরাং অধিকাংশ লোকই ব্যঙ্গকারের উপর চটিয়া যায়, এমন কি সমালোচক এবং সাহিত্য বিচারকরাও। কারণ তাঁহাদের পিঠেও কোনও ব্যঙ্গকারের কশাঘাত যে পড়ে নাই তাহা কে বলিবে? শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকারের চাবুক শুধু নিজের সমাজে এবং নিজের কালেই আবদ্ধ নহে। সে চাবুকের শপাশপ শব্দ যুগ হইতে যুগান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। তাই ওই খুঁতধরা লোকটার উপর কেহ খুশী হইতে পারে না। তাই সব সাহিত্যের সুধী সমালোচকরা বলেন—'Satire is not the greatest type of literature'—ইহা বলাই স্বাভাবিক। গালিভার্স ট্র্যাভেল্‌স্ পুস্তকের লিলিপুটরা বা ব্রবডিংন্যাগরা নানাবেশে মানব সমাজের সর্বস্তরে সর্বদা বিরাজমান। Swift রূপক ব্যঙ্গকাব্যে তাহাদেরই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তাই তাঁহার উপর অনেকেই তেমন প্রসন্ন নহেন। Mr. Kenneth Tynan বার্ণাড শ'কে 'demolition expert' বলিয়াছেন [১]। James Sutherland কিন্তু ব্যঙ্গকারদের উপর অতটা বিরূপ নহেন। তিনি বলিতেছেন—"The motives that lead to satire are varied, but there is one motive that may almost be called a constant; the satirist is nearly always a man who is abnormally sensitive

(১) English Satire : James Sutherland, p. 1

to the gap between what might be and what is, just as some people feel a sort of compulsion when they see a picture hanging crooked to walk up to it and straighten it, so the satirist feels driven to draw attention to any departure from what he believes to be the truth or honesty or justice. He wishes to restore the balance, to correct the error and often, it must be admitted, to correct or punish the wrongdoer···much of the worlds' satire is undoubtedly the result of a spontaneous or self-induced overflow of powerful imagination and acts as a catharsis for such emotions" [২] —এই শেষোক্ত মন্তব্যটিই সর্বাপেক্ষা সত্য। ব্যঙ্গকার কেবলমাত্র নীতিবাগীশ অডিটার বা দারোগা নহেন, তাঁহার 'powerful imagination' আছে, অর্থাৎ তিনি কবি। বাংলা সাহিত্যে যাঁহারা ব্যঙ্গকার—তাঁহারা সকলেই প্রতিভাবান কবি, সাহিত্যের অন্য ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিরাট দান। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের দিক-পালরাই বড় বড় ব্যঙ্গকার—Voltair, Rabelias, Petronius, Swift, Pope, Horace, Aristophanes, Lucretius, Goethe, Shakespeare সকলেই কোন না কোন সময়ে ব্যঙ্গের রসে মাতিয়া উঠিয়াছেন। [৩] চার্লস ডিকেন্স এবং আধুনিক যুগের বার্ণার্ড শ'কেও এই পঙ্‌ক্তিতে অনায়াসে বসানো যায়। রবীন্দ্রনাথ অতি নিপুণ ব্যঙ্গকার ছিলেন। তাঁহার 'ব্যঙ্গকৌতুক,' 'হাস্য-কৌতুক,' তাসের দেশ, অচলায়তন, 'সে'—সবই অপূর্ব ব্যঙ্গ রচনা। তাঁহার আঁকা ছবিগুলিও অনেক সময় মনে অত্যুৎকৃষ্ট

(২) J. Sutherland English Sutire. pp. 4-5.

(৩) The Anatemy of Satire by Gillert Highet, pp. 1

কার্টুনের রস জাগায়। তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতাও অনেক আছে। প্রতিভাধর কবিরা কেহই রঙ্গ-ব্যঙ্গ-রস বিবর্জিত নহেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ করা মানব মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা। কবিদের প্রতিভা সে প্রবণতাকে উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করে। বিখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রকার 'পিসিয়েল' এর মুখে শুনিয়াছি তাঁহার কাছে নাকি টলস্টয়, ডিকেন্স প্রভৃতি সাহিত্যিক প্রবরদের আঁকা কার্টুন সংগ্রহ আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু ব্যঙ্গকার নহেন, তিনি বড় নাট্যকার এবং কবিও। মনের একটা বিশেষ মেজাজে তিনি 'আষাঢ়ে' 'হাসির গান' 'কল্কি অবতার' এবং 'আনন্দ বিদায়' লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দ্বেষ নাই, নিছক ব্যঙ্গ আছে। Sutherland সাহেবের ভাষায়—ইহারা 'overflow of powerful imagination'।

কবিশেখর কালিদাস রায় কথা সাহিত্যে 'রঙ্গ ব্যঙ্গে' দ্বিজেন্দ্র লাল প্রবন্ধে লিখিয়াছেন — "দ্বিজেন্দ্র লালের হাসির গান ও কবিতাগুলির সমজদার হতে হলে সে কালের দেশ ও সমাজের খবর কিছু কিছু রাখা চাই'—তিনি তৎকালীন সমাজের যে ছবি আঁকিয়াছেন সে ছবি বর্তমানে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাল্য-বিবাহ, ঘোমটা আর নাই। এখন যৌবনেও বিবাহ হয় না এবং স্ত্রীলোকদের বেশবাস দেখিয়া পুরুষদেরই ঘোমটা দিতে ইচ্ছা করে। এখন বিলাত ফেরতরা সমাজে স্থান পাইবেন কিনা সে প্রশ্ন নাই, বিলাত-ফেরত জামাই পাইলে কন্যার পিতারা বর্তিয়া যান, জামাই যে বিলাত-ফেরত একথা কোথাও কোথাও বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রেও বিজ্ঞাপিত হইতে দেখিয়াছি। এখন অনেক ছেলে-মেয়ে বিলাতে গিয়াই বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। অসবর্ণ বিবাহ আজকাল সমাজে স্বচ্ছন্দে চলিতেছে, স্বামী-স্ত্রী উপার্জন না করিলে সংসার চলিবে না এ ধারণাটা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। Co-education আজকাল প্রতি স্কুল, কলেজে। ইহাতে যদিও education টা হয়তো নাই—'Co' টাই আছে, কিন্তু সেজন্য কেহ বিচলিত নহেন। এখন তথাকথিত ভদ্রঘরের বিবাহিতা বা অবিবাহিতা রমণীরা সুলভ হইয়া পড়িয়াছেন, মৃতদার ব্যক্তিদের

দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার আর প্রয়োজন হয় না। অকৃতদারেরাও কাঁধে দারার জোয়াল চাপাইয়া দায়িত্ব বন্ধনে নিজেদের বাঁধিতে চাহেন না। জন্ম-নিরোধ আমাদের গভর্ণমেণ্ট আজকাল সঙ্গত মনে করিতেছেন। হয়তো কিছু দিন পরে ভ্রূণ-হত্যাও এদেশে আইনসঙ্গত হইবে। সমাজের এই পরিবর্তিত অবস্থাতেও কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ রচনা সমান লাগ-সই। তাহার কারণ তাঁহার ব্যঙ্গ রচনার লক্ষ্য আদর্শ-ভ্রষ্ট মানুষ, সে মানুষ সে যুগেও ছিল, এ যুগেও আছে এবং সম্ভবত সব যুগেই থাকিবে। তাই তাঁহার চাবুকের জন্য পৃষ্ঠের কখনও অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে ভণ্ডামি, যে ন্যাকামি, যে গোঁড়ামি ও যে গুণ্ডামিকে তিনি ব্যঙ্গ-বাণে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন সে সব বর্তমান সমাজে সগৌরবে বিবর্ধমান। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরে এবং অত্যাধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ঢেউ লাগিয়া সে সবের মুখোশ পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। বিখ্যাত ব্যঙ্গকার Swift বলিয়াছেন "Satire is a sort of glass wherein beholders generally discover every body's face but their own, which is the chief reason for the reception it meets in the world and so very few are offended with it"। Swift সাহেবের এ কথার সহিত কিন্তু মতের মিল হইল না। Swift-এর উপরই কত লোক বিরূপ হইয়াছিলেন তাহা কি নিজে তিনি জানেন না? যাহাদের লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ বাণ ছোঁড়া হয় তাঁহারা সেটা বুঝিতে ঠিকই পারেন, কিন্তু ভান করেন যেন পারেন নাই। কানে তুলা দিয়া এবং পিঠে কুলা বাঁধিয়া এই সব গণ্ডার চর্মধারীরা মুখে একটা স্মিতহাস্য ফুটাইয়া সমাজে নির্লজ্জের মতো বিচরণ করিতে দক্ষ। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাদের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্বেষের বিষ উদগীরণ করেন নাই। 'আনন্দ-বিদায়' রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত বটে কিন্তু ইহাতে বিদ্বেষ নাই। আছে রঙ্গ ব্যঙ্গের

মাধ্যমে প্রতিবাদ। এবং তিনি ইহা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া। 'তুমিও শেষে এমনটা করিতেছ'— এই স্বপ্নভঙ্গ, এই আক্ষেপই ব্যঙ্গে রূপান্তরিত হইয়াছে। তিনি নিজেকেও কম ব্যঙ্গ করেন নাই। উদাহরণ 'আলেখ্য' কাব্য গ্রন্থের দ্বাদশ চিত্র—'মগুপ' কবিতাটি। হাসির গানে তাঁহার 'জিজিয়া কর' বা 'খুসরোজ' কবিতা দুটিও নিজের প্রতি ব্যঙ্গ। চাকুরি, জীবনের গ্লানি, পঙ্ক হইতে এই সব কবিতা শতদলের মতো ফুটিয়াছে। 'জিজিয়া করে'—

"পড়ে আছি চরণ তলায় নাকটি গুঁজে অনেক কাল
সৈবে সবই নই তো মানুষ আমরা সবাই ভেড়ার পাল
যে যা করিস দেখিস চাচা:মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা
সাঁশটা খেয়ে আঁশটা ফেলে দিসরে দুটো দুবেলায়।'

কিম্বা 'খুসরোজে'—

"আমরা সব 'রাজভক্ত' রাজভক্ত' বলে' চেঁচাই উচ্চরবে
কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে
আমাদের ভক্তি যা এ—মানের প্রাণের পেটের দায়ে
দেখে সে রক্ত আঁখি ভক্তি যা তা ছুটে পালায়
সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

হাসির গানে আরও অনেক কবিতা আছে যাহা নিজের প্রতিই ব্যঙ্গ। প্রথম প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পাক্কা সাহেবী জীবন-যাপন করিতেন। নিজের নামটা পর্যন্ত বদলাইয়া 'মিঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রে' করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে 'ধুতি-চাদর-নিবারিণী' সভাস্থাপনও তাঁহারই কীর্তি। 'বিলাত ফের্তা' কবিতায়

"আমরা সাহেব সঙ্গে পটি
আমরা মিষ্টার নামে রটি
যদি "সাহেব" না ব'লে 'বাবু' কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর
আমরা হ্যাট বুট আর কোট প্যাণ্ট পরে'
সেজেছি বিলিতি বাঁদর।"

মনে হয় তিনি নিজেকেই যেন ব্যঙ্গ করিয়াছেন। 'পাঁচটি এয়ার' কবিতাতেও সেই সন্দেহ হয়। এ কবিতায় তাঁহার নিজের বেপরোয়া 'আমি কাউকে তোয়াক্কা করি না বাবা' ভাবটিকেই তিনি যেন ব্যঙ্গের হোজ পাইপের সম্মুখীন করিয়াছেন।

"আমরা পাঁচটি এয়ার
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা
আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধু খেয়ার—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস আমরা পাঁচটি এয়ার।
দেখ, ব্র্যাণ্ডি মোদের রাজা আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী
আমরা করিনে কাহারে ডর আমরা করিনে কাহারে হানি
আমরা রাখিনে কাহারও তক্কা, আমরা করিনে
কাউরে কেয়ার
এ ভব মাঝে সবই ফক্কা—জেনেছি আমরা পাঁচটি এয়ার।"

তাঁহার 'Reformed Hindoos' কবিতাতেও কি তিনি নিজেকে বাদ দিতে পারিয়াছেন? তিনি নিজেও কি ওই সমাজভুক্ত ছিলেন না? Reformed Hindoos—এর যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহার সহিত হয়তো তাঁহার চরিত্রের পুরাপুরি সাদৃশ্য নাই। কিন্তু খানিকটা আছে বইকি। উদ্ধৃত করি একটু

আমরা Reformed Hindoos
It must be under-stood
যে একটু heterodox আমাদের food.

কারণ চলে মাঝে মাঝে 'এটা 'ওটা' 'সেটা' যখন we choose
কিন্তু সমাজে তা স্বীকার করি if you think
তালে you are an awful goose
আমাদের ভাষা একটু quaint as you see
এ নয় English কি Bengali
আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer
কোন ধর্মের ধারি না ধার
করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists
the Mahomedans, Christian and Jews
কিন্তু ফলার ভোজে হিঁদু নই if you think
তা'লে you are an awful goose."

এরকম আরো অনেক কবিতা আছে যেখানে ব্যঙ্গের খোঁচাটা তাঁহার নিজের গায়েও লাগিয়াছে। কিন্তু বড় শিল্পী মাত্রেই নির্বিকার। গম্ভীর কবিরা যখন যেখানে সৌন্দর্য দেখেন তখন তাঁহার কল্পনা যেমন ভাবাবিষ্ট হয়, ব্যঙ্গকার কবিও তেমনই যখনি যেখানে অসঙ্গতি দেখেন তখনই তাঁহার নির্মম শিল্প প্রতিভা চকমক করিয়া ওঠে। খামখেয়ালী পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন, বেপরোয়া চাকুরী লাঞ্ছিত দ্বিজেন্দ্র-লালকে ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালই নানা কবিতায় উপহাস করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সব ব্যঙ্গ রচনাই 'ব্যঙ্গ' নহে। পূর্বেই বলিয়াছি ব্যঙ্গ-রসে রৌদ্ররস হাস্যরস এবং অদ্ভুত রসের সমন্বয় ঘটে। তাঁহার সব কবিতাতে এ সমন্বয় নাই। অনেক কবিতাই বিশুদ্ধ হাস্যরসের কবিতা।

ব্যঙ্গরসের পরিচয় পাই সেখানে, যেখানে কবি চটিয়াছেন কিন্তু আত্মবিস্মৃত হন নাই, হাসি মুখে তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিতেছেন। ইহার উদাহরণ 'কল্কি অবতার' 'আনন্দ বিদায়' 'ত্র্যহস্পর্শ' 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি প্রহসন গুলিতে। 'আনন্দ বিদায়' ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশ্যে লিখিত বলিয়া হয়তো ঈষৎ হীনপ্রভ। কিন্তু ইহাতে ব্যঙ্গকারের ব্যঙ্গ-

নিপুণতা বিস্ময়কর। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ-নিপুণতা আরও বিস্ময়কর তাঁহার হাসির গানের কয়েকটি কবিতায়। 'জিজিয়া কর' 'খুসরোজ' 'Reformed Hindoos' 'বিলেতা ফেতা' এবং আরও অনেক কবিতায়। এ কবিতাগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি পূর্বেই দিয়াছি। হাসির গানের কবিতা হইতে আরও কিছু কিছু নমুনা দিতেছি।

"চম্পটির দল (ইউরেশিয়ানদের উদ্দেশ্যে বোধহয়)

চম্পটির দল আমরা সবে
একটু মেশাল রকম ভাবে
আমরা কজন এইছি ভবে।
যদি কিছু দেশী রং
রেখেছি সাহেবী ঢং
একটু তবু নেটিভ গন্ধ
কি কর্ব্ব তা রবেই রবে।
ইংরেজীতে কহি কথা
সেটা 'পাপার' উপদেশ
হ্যাট্টা কোট্টা পরি কেন
কারণ সেটা সভ্য বেশ।
টেবিলেতে খাচ্ছি খানা
কারণ সে সাহেবিয়ানা
খাই বা যদি শাক চচ্চড়ি
টেবিলেতে খেতেই হবে···

হ'ল কি হ'ল কি—এ হ'ল কি
এত ভারি আশ্চর্যি
বিলেত ফেরতা টানছে হুকা
সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্যি।
হোটেল ফের্ত্তা মুন্সেফ ডাকছেন
মধুসূদন কংসারি

চট্ট চটির দোকান খুলে
দস্তুর মত সংসারী !”

সমাজের ভাঙনের, যা-খুশী করিবার প্রবৃত্তির অনেক উদাহরণ আছে এ কবিতায়। শেষটি এইরূপ—

“রাধাকৃষ্ণ রঙ্গ-মঞ্চে
নাচছেন গিয়ে আনন্দে
ব্যাখ্যা করছেন হিন্দু-ধর্ম
হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে।
শাস্ত্রীবর্গ কোনই শাস্ত্রের
ধারেন না এক বর্ণ ধার
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবার্ণবে
বেশী মাত্রায় কর্ণ-ধার।”

এই সমাজের আলোকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদেরও পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাঁহার ‘নব কুল কামিনী’ কবিতায়—

“ক’টি নবকুল কামিনী
অন্ধকার হইতে আলোকে চলেছি মন্দ-গামিনী।
জানি জুতা, মোজা, কামিজ পরিতে
চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে
পারত পক্ষে উপর হইতে
নীচের তলায় নামি নে,
গৃহের কার্য করুক সকলে
খুড়ি, জেঠী, পিসী, মাসিতে
আমরা সবাই নব্য-প্রথায়
শিখেছি হাসিতে কাসিতে’
করিতে নাটক নভেল শ্রাদ্ধ
করিতে নৃত্য গীত, বাদ্য

বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে
ঘুরিতে দিবস যামিনী।
ব্যবসা করিয়া, চাকুরি করিয়া
আমুক অর্থ পতিরা
রাজি আছি, তাহা খরচ করিয়া
বাধিত করিতে সতীরা।"

এ কবিতার শেষ লাইন—

"যেমন সভ্য স্বামীরা, তাহার
চাই ত যোগ্য ভামিনী।"

'বলি ত হাসব না' কবিতাটিতে কবি ব্যঙ্গের অট্টহাস্য করিয়াছেন।

"বলিত হাসব না, হাসি রাখতে চাইত চেপে
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে
যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে!
সাহেব-তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলস্থ স্ত্রীর
ভূত-ভয়-গ্রস্ত পগারস্থ মস্ত মস্ত বীর
যবে সব কলম ধ'রে গলার জোরে
দেশোদ্ধারে ধায়
তখন আমার হাসির চোটে বাঁচাই মোটে
হ'য়ে ওঠে দায়!
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক শাস্ত্রিবর্গ
টিকি দীর্ঘ নাড়ে
একটু 'গ্যানো পড়ে' কেহ চড়ে
বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে
কোর্তে এক ঘরের মস্ত বন্দোবস্ত
ব্যস্ত কোন ভায়া
তখন আমি হাসি জোরে গুম্ফ ভরে
ছেড়ে প্রাণের মায়া।"

ভীরু, ভণ্ড, বক-ধার্মিক, সভ্যতার ছদ্মবেশ পরিহিত বর্বরদের সম্বন্ধে তিনি নির্মম ছিলেন। যাহারা কথায় কথায় গীতা আওড়ায় অথচ প্রতিটি কাজে গীতার বিপরীত আচরণ করে, তাহাদের উদ্দেশ্যেই তাঁহার বিখ্যাত 'গীতার আবিষ্কার' কবিতাটি। এ কবিতার শেষ কলিটি শুনুন—

"গীতার জোরে সচ্ছে ঘুষি, সচ্ছে কান্মুটিটে
গীতার জোরে পেটে না খাই, সয়ে যাচ্ছে পিঠে
করি যদি ধাপ্পাবাজী, মিথ্যে মোকর্দমা
স'য়ে যাবে—গীতার পুণ্য অনেক আছে জমা
মাঝে মাঝে তুলনায় মনে হয়, এ হেন
মুর্গার কোর্মার চেয়ে আমার গীতাই মিষ্টি যেন
আমার গীতাই মিষ্টি যেন।
(কোরাস্) গীতার মত নাইক শাস্ত্র গীতার পুণ্যে বাঁচি
বেঁচে থাকুক গীতা আমার গীতায় ম'রে আছি
বাবা! গীতায় মরে আছি।"

এই ভণ্ডদের উদ্দেশ্যেই লেখা 'হিন্দু'—

"এবার হয়েছি হিন্দু করুণাসিন্ধু
গোবিন্দজীকে ভজি হে
এখন করি দিবা রাত্তি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধা-রসে মজিহে।
আর মুরগী খাইনা কেন না পাইনা
(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই
আহা জান ত আমার স্বভাব উদার
(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি।"

'চণ্ডীচরণ' ও একটু অন্য-রকম ধর্ম-প্রবক্তাদের উদ্দেশ্যে লিখিত।

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থকার
এম্নি তিনি হিন্দুধর্মের কর্তেন মর্ম ব্যক্ত

দিনের মতো জিনিষ হ'ত রাতের মত অন্ধকার
জলের মত বিষয় হ'ত ইটের মত শক্ত।
... ...
রইল না কারো সন্দেহ সংসারটা এ ঝকমারি
যদিও কেউ ছাড়লে নাক ব্যবসা কি নক্‌রি
সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধর্ল মাংস রকমারি
ফাউল বিফ্‌ ও মটন হ্যাম ইন্‌ অ্যাডিশন টু বক্‌রি
(কোরাস্‌) সবাই বল্লে হাঃ হাঃ হাঃ
লিখ্‌ছে বেশ—হাঃ হাঃ হাঃ
যা হোক তোরা নিজের নিজের ঘটিবাটি সামলা।"

ইংরেজ এ দেশে আসিবার পূর্বে আমাদের সমাজে মোড়ল ছিল, উজির, নাজির সামন্ত ছিল। কিন্তু 'নেতা' নামক জীবের আবির্ভাব হইয়াছে ইংরেজী শাসন এ দেশে প্রচলিত হওয়ার পর। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'আলেখ্য' কাব্য-গ্রন্থের চতুর্দশ চিত্রে নেতার ছবি আঁকিয়াছেন। প্রথম অংশের খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি।

"কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে
গানে গানে ছেয়ে পড়ল দেশটা
কিছুই বোঝা যাচ্ছে নাক নেড়ে চেড়ে
কি রকম যে দাঁড়ায় এখন শেষটা।
সভায় সভায় হাটে-মাঠে গোলেমালে
বক্তৃতাতে আকাশ পাতাল ফাটছে,
যাদের সময় কাটত নাক কোন কালে
তাদের এখন খাসা সময় কাটছে।
নেতায় নেতায় ক্রমেই দেশটা ভরে' গেল
সবাই নেতা, সবাই উপদেষ্টা
চেঁচিয়ে তো সবার গলা ধরে' গেল
অন্য কিছুর দেখাও যায় না চেষ্টা।

লিখে লিখে সম্পাদকে কবিগণে
ভীষণ তেজে অনুপ্রাসে কাঁদছে
সবাই বলছে কি কাজ এখন 'পিটিশনে'
সবাই কিন্তু পায়ে ধরেই সাধছে।

এই নেতারই একটি ব্যঙ্গচিত্র 'নন্দলাল'। আমাদের ব্যঙ্গসাহিত্যে রত্নের মতো তাহা ঝলমল করিতেছে। কিছু উদ্ধৃত করি।

"নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ
স্বদেশের তরে যা করেই হোক রাখিবেই সে জীবন
সকলে বলিল 'আহা কর কি, কর কি নন্দলাল
নন্দ বলিল বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ
তখন সকলে বলিল বাহবা বাহবা বেশ।"

নন্দর ভাইয়ের কলেরা হইল। কিন্তু নন্দ তাহার সেবা করিতে গেল না। যদি মরিয়া যায়! 'বাঁচাটা আমার অতি দরকার'। সুতরাং সে কাগজ বাহির করিয়া সকলকে গদ্যে পদ্যে গালি দিতে লাগিল।

"পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায় খায় তার দশগুণ
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা সন্দেশ থাল থাল
তখন সকলে বলিল—বাহবা, বাহবা নন্দলাল।"

কাগজে এক সাহেবকে গালি দিয়া নন্দ কিন্তু বিপদে পড়িল। 'সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি'। নন্দলাল কিন্তু দেশোদ্ধারব্রতী, গলা-টিপুনিতে সে মারা যাইতে চায় না। সাহেবকে সে বলিল—

"বল ক'বিঘৎ নাকে দিব খৎ—যা বল করিব তাহা
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহা!

নন্দ শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়াই রহিল

"নন্দ বাড়ির হ'ত না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি
চড়িত না গাড়ি কি জানি কখনঃউলটায় গাড়িখানি ;
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ রেলে কলিশন হয়
হাঁটিতে সর্প কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল
সকলে বলিল—ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।"

সত্যই নন্দলাল আজও বাঁচিয়া আছে। শুধু তাহার ভোলটা পালটাইয়াছে মাত্র।

'আষাঢ়ে' নামক কবিতা-গুচ্ছ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহার পুরা নাম 'আষাঢ়ে বা গুটিকতক হাসির গল্প'। ছন্দে-গাঁথা এ রকম গল্পগুচ্ছ বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম এবং একেবারে অভিনব। শ্রীহরি গোস্বামী, অদল-বদল, ভট্টপল্লীর সভা, হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা, ননীরাম পালের বক্তৃতা প্রভৃতি কবিতাগুলি হাস্য-ব্যঙ্গ এবং গল্পরসে টইটম্বুর। কিন্তু 'আষাঢ়ে'তে এমন কতকগুলি কবিতা আছে যাহা ঠিক গল্প নয়। এগুলিতে গল্প অপেক্ষা ব্যঙ্গই বেশী। যেমন ধরুন সংস্কৃত ছন্দে লেখা কর্ণ-বিমর্দন কাহিনী।

"জানো না কি কদাচন মূঢ়
কর্ণ-বিমর্দন মর্ম কি গূঢ় ?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য
যদি না তা আকর্ষণ জন্য।
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর কার নয় আদর চিহ্ন ;
তবু যদি সাহিব অল্পে স্বল্পে
টানে হয় তা মধুর বিকল্পে
অন্তত নাসা রক্ষার্থে সে
কান-মলা হয় গিলিতে হেসে।"

কিম্বা 'ডেপুটি-কাহিনী'—কে জানে হয় তো ইহাতে তাঁহার আত্ম-কাহিনীর রূপ আছে—

"তড়বড় খেয়ে ভাত দড় বড় ছুটি—
অপিসেতে চলে যান নবীন ডেপুটি
অতি এক লক্ষ্মী ছাড়া ছক্কর করিয়া ভাড়া
তাতে দুটি পক্ষিরাজ বাঁধা
একটি লোহিত বর্ণ অপরটি সাদা।
(২)
পরিয়া ইংরাজী প্যাণ্ট গলা আঁটা কোটে
চাপকান্ অঙ্গে আর রোচেনাক মোটে
অথচ ইংরেজি সজ্জা পরিতেও হয় লজ্জা
ভয়তেও কতকটা বটে
বাবুদের সাহেবিতে সাহেবেরা চটে।
(৩)
এদিকে অন্তরে জাগে ইচ্ছা অবিরত
সাহেবিটা, বাহিরেতে পোষাকে অন্তত ;
কেরাণীর চাপকান্ পরিতেও অপমান
এই বেশ তাই পরিবর্তে
ত্রিশঙ্কুর মত স্থিতি না স্বর্গে না মর্তে।
(৪)
তদুপরি শিরে শোভে 'ধুম্রপানসেবী
সাহেবের ক্যাপ—নয় অথচ সাহেবী
কিনারা উলটানো তার
কি রকম বোঝা ভার
অনেকটা বহুরূপী;
চিৎপুর উদ্ভাবিত অত্যদ্ভুত টুপি।"

এই বেশে ডেপুটি সাহেবের অপিস-যাত্রা। সেখানে নানা উকিল

করিয়াদী আসামী-পূর্ণ এজলাস, কেরানীদের সম্ভ্রম। আদালতে বিচারের প্রহসন ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া তাঁহার গৃহস্থালীরও অপরূপ বর্ণনা দিয়াছেন কবি। তারপর মুন্সেফ বাবুর বাড়ি প্রত্যহ তাস-পাশা খেলা, বাড়িতে ফিরিতে রোজ দেরি—

"১১ ১২টা কভু—ফিরিয়া আসিলে প্রভু
স্ত্রীর সঙ্গে হ'ত বিসম্বাদ
বুঝে ওঠা হ'ত ভার কার অপরাধ।"

তারপর বদলি। প্লীহা সারাইবার জন্য একেবারে চট্টগ্রামে গেলেন। সেখানে তিন বৎসর বাস। শেষটা বড় করুণ দৃশ্য—

"এইরূপ করিলেন সৌভাগ্যের ক্রোড়ে
বুদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিজ্ঞতার জোরে।
সপুত্রকলত্র কন্যা ডেপুটির অগ্রগণ্যা
('অগ্রগণ্য' ব্যাকরণ সঙ্গত) সর্বাঙ্গ
সুন্দর সৌন্দর্যপূর্ণ জীবলীলা সাঙ্গ।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল তাহার পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে 'মুন্সেফ আবিষ্কার' নামে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি বড়। সামান্য সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি।

নিয়তি একদিন সন্ধ্যাকালে বিধাতাকে গিয়া বলিলেন—আপনার সৃষ্টিতে 'তাক্' লাগিবার মতো কিছুই নাই।

"মানুষেরা হাসে গায়
সকলেই খায় দায়
একই ভাবে বন্ধুসনে গল্প করে সবে
এর মধ্যে আছে বল আশ্চর্য কি তবে?"

বিধাতা বিশ্বকর্মাকে তলব করিয়া—এই একই প্রশ্ন করিলেন। বিশ্বকর্মা প্রতিশ্রুতি দিলেন তাক্ লাগানো জীব তিনি সৃষ্টি করিবেন এবং বিধাতাকে তাহার বর্ণনা দিলেন—

"এই শ্রেণী দেখা হলে ফিরাইবে মুখ
করিবে না অভ্যর্থনা, কহিবে না কথা
সদাই ভাবনা আর সদাই বিমুখ
হুজুরের তুষ্টিলাভে হইলে অন্যথা ;
সদাই ভাবনা ভবে
কবে সবজজ হবে
ক'টা মেয়ে পার হল কটা আছে বাকী
ভাবিবে এ কথা নিত্য বসিয়া একাকী।

এদের দিয়েছি আয়—দিই নাই ব্যয়
এদের দিয়েছি দন্ত হাসি নাহি তায়
এদের দিয়েছি কণ্ঠ কথা নাহি কয়
দিয়েছি উদর, পেট ভরে' নাহি খায় ;
কেবল অঙ্গুলি তার করে মাত্র ব্যবহার
গলদেশে মালা তার দু'পয়সা হারে
শিরোদেশে টিকি তার আপনিই বাড়ে।"

'আষাঢ়ে' পুস্তকের 'কেরানী,' 'বাঙ্গালী মহিমা' 'বৃদ্ধা কুমারী কাহিনী', 'কলিযজ্ঞ' প্রভৃতি কবিতাতেও গল্প রসের অপেক্ষা ব্যঙ্গরসই বেশী। একটু একটু উদ্ধৃত করি। 'কেরানী'—

"খেটে খেটে খেটে
—বলতে আপন দুঃখের কথা হৃদয় যায়গো ফেটে
চাইলাম গিয়ে অন্ন ত গৃহিণী এলেন তেড়ে
তাঁর সে সুদর্শন চক্র স্বর্ণনথটি নেড়ে—
সারা দিনটা খাটি
শরীর করে' মাটি
পোড়ার মুখো ! কাহিল হলাম যেন একটি কাঠি
ছেলে কোলে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ফুলে গেল পা-টা
তবু বলে' শুয়ে আছ ! নিয়ে আয় তো ঝাঁটা !

বাঙ্গালী মহিমা—'

খোল ইতিহাস—সতর তুরস্ক প্রবেশিল যবে গৌড়েতে
লক্ষ্মণ সেন ত দিলেন চম্পট কচুবনে এক দৌড়েতে।
সে অপূর্ব আধ্যাত্মিক দীর্ঘ পলায়ন কাহিনী
যোগ্য ছন্দ-বন্ধে বোধহয় আজিও ভাল ক'রে কেহ গাহিনি।
পরে আফগান মোগল পাঠান দলে দলে দেশ জুড়িয়া
করিল রাজত্ব : তাহাও বীরত্বে সহিল বাঙালী উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ : বাঙালী (লেখে ত সব ইতিহাস বহিতে)
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরেজের কোলে পাঠানের ক্রোড় হইতে !
করেছে সংগ্রাম মারহাট্টা শিখ মূর্খ যত সব মেড়ুয়া
তুমি সূক্ষ্মবুদ্ধি সন্ন্যাসীর মতো (যদিও পরনি গেরুয়া)
নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে বুঝে নিলে সব পলকে
'ভবিতব্য লিপি কে খণ্ডাতে পারে? কাটাকাটি করে'ফল কি !'

বাঙালী 'অগ্নি যুগে' যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল—এ কবিতা তাহার পূর্বে রচিত।

'বৃদ্ধা কুমারী কাহিনী'—

অতি করুণ কাহিনী। কুমারী প্রথম যৌবনে ভাবিয়া ছিল রাজপুত্র সাধিয়া আসিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু রাজপুত্র আসিল না, মন্ত্রীপুত্র না, কোটাল পুত্র না, এমন কি শেষ পর্যন্ত কেহই আসিল না। কবিতার শেষ দুই ছত্র এই :

'যদি বুঝে টান নাহি দাও লাগসৈ
পরে উঠিবে না কিছু বঁড়শীটি বই।'

'কলিযজ্ঞ'—মনে হয় কংগ্রেসকে বিদ্রূপ—সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দে লিখিত। একটু উদ্ধৃত করি। কলিযজ্ঞে প্রদত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে—

"এরূপ শুদ্ধ ইংরাজী, এরূপ উপমা ছটা
এরূপ শব্দবিন্যাস এরূপ দ্রুত বক্তৃতা।

সিসিরো পিট বর্কাদি কাছাকাছি ত নিশ্চয়
একবাক্যে মহাহর্ষে বলিলা সব কাগজে ॥
চা-পান-নিরত প্রাতে ইংরাজ লাট সাহেব
পড়িয়া এ মহাবার্তা আতঙ্কেতে বিমূর্ছিত।

'হাসির গানে'র অনেক কবিতায় ব্যঙ্গরস নাই বিশুদ্ধ হাস্যরস আছে। রাম বনবাস, দুর্বাসা, কালোরূপ, কৃষ্ণ রাধিকা সংবাদ নতুন কিছু করো, হ'ল কি, প্রণয়ের ইতিহাস, প্রাণান্ত, বুড়াবুড়ি বিরহ-তত্ত্ব, চাষার প্রেম, বিষ্যুৎ বারের বারবেলা, বিলেত, বর্ষা প্রভৃতি কবিতা বিশুদ্ধ হাস্যরসের কবিতা। একটি মাত্র নমুনা দিতেছি। কালোরূপ—

"কালোরূপে মজেছে এ মন
ওগো সে যে মিশ্‌মিশে কালো, সে যে ঘোরতর কালো
—অতি নিরুপম।"

কোকিল কালো ভোমরা কালো, আমরা কালো তোমরা কালো, মুচি-মিস্ত্রী ডোমরা কালো, কিন্তু জান না কি কালো—সেই কালো রং। কালী কালো মিশি কালো অমাবস্যার নিশি কালো, গদাধরের পিসী কালো কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ, ওগো সে কালো বরণ। ত্র্যহস্পর্শ, পুনর্জন্ম, বিরহ প্রহসন তিনটিও হাস্যরসের উৎস। তাঁহার অন্যান্য নাটকগুলিতে তিনি যে সব চরিত্র হাস্যরস বা ব্যঙ্গের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন সেগুলিও পরম উপভোগ্য। রাণা প্রতাপ সিংহে মেহের, মেবার পতনে হেদায়েৎ, সাজাহানে দিলদার, কল্কি অবতারে বিদ্যানিধি, পাষাণীতে চিরঞ্জীব, চন্দ্রগুপ্তে বাচাল প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যই অনন্য। সত্যই তিনি বাংলা সাহিত্যের রঙ্গ-ব্যঙ্গের আসরে অদ্বিতীয়। তাঁহার মতো বিশুদ্ধ গ্রাম্যতাদোষহীন অথচ শাণিত সাহিত্যিক ব্যঙ্গ ইতিপূর্বে আর কেহ করেন নাই। ব্যঙ্গকার দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্যে একটি কবিতায় আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করি।

বঙ্গ সাহিত্যের পথে
যুগ যুগান্তর হ'তে
কলোল্লাসে বাজায়ে কিঙ্কিনী
রঙ্গ-ব্যঙ্গ আনন্দের বহে স্রোতস্বিনী।
নদী সে বিচিত্রা মহীয়সী
কখনও উত্তাল মেঘনা—কভু উগ্রী সুশ্রী রূপসী।
কিন্তু সে তো নদী নয়—রঙ্গমত্ত জনতা নির্ভীক—
নাই তার সংখ্যা সীমা, নাই তার ঠিক বা বেঠিক
আছে তাতে সাধু চোর, আছে তাতে সতী ও অস
আছে গজ অশ্ব রথ আছে রথী আছে মহারথী
আরও কত জন আছে যাহাদের নাহিক নিরিখ
অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু আছে, আছে পদাতিক।
আছে নানাবিধ সং
বিবিধ বিচিত্র ঢং
ঢঙ্গায়িত স্বকীয় ধরণে :
কাহারও চরণে
ঝুমঝুম বাজিছে নূপুর,
সামান্য বাঁশীতে কেহ তুলিয়াছে অসামান্য সুর,
মুখ ভঙ্গি করি'
মাথায় উষ্ণীষ ধরি'
ভুঁড়িটারে আস্ফালন করিতেছে কোন বিদূষক :
কেহ বা না-হক
দন্ত বিকশিত করি কোমর দুলায়ে
ইতরে ভুলায়ে
তুলিয়াছে হাস্যের রোল :
গম্ভীর কাহারও খোল
তুলিতেছে টপ্পার বোল :

চারিদিকে ছড়াইয়া হাস্যের রং
কোথাও বা চলিয়াছে 'জেলে পাড়া' সং ঃ
ম্যাণ্ডোলিন চেলো সাথে কোথাও বা মৃদঙ্গ মন্দিরা
ছড়াইছে আনন্দ মদিরা ঃ
কেহ ফোঁকে রাম সিঙা, কেহ পেটে টিন ঃ
এস্রাজ সেতার বেণু-বীণ
কোথাও বা হয়েছে উত্তাল
এরই মাঝে এলে তুমি হে দ্বিজেন্দ্রলাল
বিকীর্ণ করিয়া এক যাদুকরী অপূর্ব মাধুরী
হস্তে লয়ে বাজি, ফুল-ঝুরি।
সমুজ্জ্বল ফুলকির পুষ্পবৃষ্টি হ'ল চারিভিতে।
তারাবাজি, তুবড়ি ও আতশ বাজিতে
আকাশে ফুটিল ফুল অজস্র ও বিবিধ বরণ
হাউই ছুটিল যেন তীরের মতন!
মহাশূন্যে উদ্ভাসিল হীরা পান্না চুনী পোখরাজ
মনে হ'ল কুবেরের রত্নাগার আজ
উজাড় করিয়া কেহ ছড়াইছে মুঠা মুঠা মণিমুক্তারাজি
একি সত্য? একি স্বপ্ন? একি ভোজবাজী?
প্রদীপ্ত প্রতিটি রত্ন প্রতিভার অনন্য প্রভায়
বিচ্ছুরিল যে কিরণ অনবদ্য অপূর্ব শোভায়
অত্যদ্ভুত আলোকে তাহার
রূপান্তরও ঘটে গেল সে শোভা যাত্রার।
অদ্ভুত সে রূপান্তর
পর্বত হইয়া গেল সহসা প্রান্তর।
চূড়ামণি, শিরোমণি, তর্করত্ন আদিসব সেরা সেরা ব্রাহ্মণের পাল
হ'য়ে গেল নিমেষেতে কুকুর শৃগাল সাপ উল্লুক বিড়াল,
হ্যাট কোট টাইপরা বড় বড় দিকপাল তিমি

নিমেষেতে হয়ে গেল ক্রিমি
দাড়িওলা হোমরা-চোমরা বিশাল পুরুষ
ন্যাকামির প্রকোপেতে বুনিতে লাগিল 'লেস'
লইয়া কুরুশ।
সমাজের গণ্যমান্য বড় বড় হাতী ও গণ্ডার
লম্ফে লম্ফে পার হল ভব্যতা-পগার
ভেক রূপ ধরি!
গোস্বামী শ্রীহরি
পরিয়া ব্যঙ্গের ফাঁস—হয়ে গেল ঘুঘু
—মালকোষ হল যেন কাফি
শ্বশুরবাড়ি যাত্রী হরি আধখানা দাড়ি লয়ে
হুম্বা সম করে দাপা দাপি।
হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থকার শ্রীচণ্ডী চরণ
সন্দেহ করিল সবে—ঘটি বাটি করেন হরণ।
দেশভক্ত নন্দলাল পাশ বালিশের মতো
বিছানায় বিস্তারি' নিজেকে
দেখা গেল প্রাণপণে আগুলিয়া রয়েছেন
প্রাণ-পক্ষীটিকে!
যে কেরানী-পদ লাগি একদিন বহু তৈল হ'ল নিঃশেষিত
শোনা গেল আর্তকণ্ঠে তাহাদের গীতও—

'খেটে খেটে খেটে
হয়ে গেলাম বেঁটে
পড়ে গেল কপালেতে বড় বড় রেখা
কানে যায় না শোনা ভালো চোখে যায় না দেখা
চল্লিশ বছর থেকেই চুলও গেল পেকে
মাংসও গেল ঝুলে, সুঠাম শরীর গেল বেঁকে

দাঁতও হ'ল জীর্ণ এবং ভুঁড়ি গেল থেমে
চিবুক গেল উঠে এবং নাক গেল নেমে'।

সহসা বক্তৃতা-রত ধর্মধ্বজী নসীরাম পাল
ভাবাবেগে চেয়ারে অজ্ঞান হ'ল। 'সামাল সামাল'
চীৎকারিল সবে। কেনারাম কর্মকার
নিধিরাম সর্দার, কুড়োরাম পোদ্দার
কেনারাম তেলী
শেষ করি সেই সভা-কেলি
নিজ নিজ গৃহে যবে ফিরিল সত্বর।
হা-হা-হা-হা অট্টহাস্যে কাঁপিল অম্বর।

তারপর অন্য দৃশ্য :
দেখা গেল 'কলি যজ্ঞ'—মহাসভা—মস্ত আসর
তাহার বর্ণনা করি অনুষ্টুপে ভেসে আসে কার মিষ্ট স্বর ?
"ব্যারিষ্টার উকিলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য মহতী সভা।
আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে
মান্দ্রাজী, উড়িয়া, শিখ, বঙালী চ দলে দলে॥
কাহারও পরণে কুর্তি, কাহারও উড়ুনি উড়ে
কাহারও বা ঝুলে চাপকান, কাহারও সাহেবী ধড়া॥
কাহারও সম্মুখে টেড়ি, কাহারও পিছনে টিকি
কাহারও উপরে ঝুণ্ট—কা কস্য পরিবেদনা॥
এরূপ বিবিধা মূর্তি সমাগত সভাতলে
বক্তৃতা করিয়া বাবা লড়াই করিতে ফতে॥
তন্মধ্যে মুখ সর্বস্ব বাঙালী হি পুরোহিত
রেজলুশন নির্মাণে বক্তৃতায় মহারথা॥

... ...

পরিশেষে সভাস্থানে সবাই অপরাজিত
দিলে হি বক্তৃতা চোটে উড়াইয়া পরস্পরে ॥
বাঙালী মহিমা কীর্তি কলাপ কাহিনী যদি
শুন মন দিয়া বাবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

তারপর হা হা হাসি পুনরায় ধ্বনিল অম্বরে
থেমে গেল সহসা আবার ; নীলাম্বরে
দেখিলাম স্বরঞ্জিত জ্যোতির্পটভূমি
আকাশ ও ধরণীরে রহিয়াছে চুমি'—
তার মাঝে বিরাট বিশাল
দাঁড়াইয়া আছ তুমি ব্যঙ্গকার হে দ্বিজেন্দ্রলাল
মুখে তব স্নিগ্ধ হাসি, চোখে ঝরে জল
অসংখ্য প্রণাম লহ, ওগো ব্যঙ্গকার কবি, হে দেশবৎসল ।